POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 6
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

সংখ্যা 42
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

21 ই অক্টোবর, 2021 ● 14 রবিউল আওয়াল 1443 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَالۡمَيۡسِرُ وَالۡاَنۡصَابُ وَالۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্য-কলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এইগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

(মায়েদা: ৯১)

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লা যাকে না চাইতে এবং আকাঙ্খা না করতেই দান করেন ।

১৪৬৯) হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে ভাতা দিলে আমি বলতাম: 'আপনি তাদেরকে দিন, যাদের আমার থেকে বেশি প্রয়োজন।' তিনি (সা.) বলতেন,'এই সম্পদ থেকে যখন তোমার কাছে কিছু আসে, তখন তা নিয়ে নাও। এমতাবস্থায় যখন তুমি তা পাওয়ার বাসনা রাখ না কিম্বা এর থেকে যাচনা কর না। আর না পেলে তার জন্য লালায়িত হয়ো না।

যাচনা করাকে ভর্ৎসনা এবং এর আযাব

১৪৭৪) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন-'মানুষ লোকের কাছে যাচনা করে বেড়ায়, এমনকি কিয়ামত দিবসে সে এমন অবস্থায় আসবে যখন তার মুখমণ্ডলে মাংসের একটি টুকরোও থাকবে না।'

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১০ ও ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত সিঙ্গাপুর, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),
প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)
হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ

আরবীতে 'সিদ্দীক' সত্যবাদিতার পরম রূপকে নির্দেশ করে এবং এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যে সত্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়, তার নিজস্ব বলতে আর কিছুই থাকে না। এমন ব্যক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সততা মেনে চলে এবং সত্যের প্রকৃত সাধক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সত্যবাদিতার মর্যাদা

আরবীতে 'সিদ্দীক' সত্যবাদিতার পরম রূপকে নির্দেশ করে এবং এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যে সত্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়, তার নিজস্ব বলতে আর কিছুই থাকে না। এমন ব্যক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সততা মেনে চলে এবং সে সত্যের প্রকৃত সাধক। এই পর্যায়ে উপনীত হয়ে মানুষ 'সিদ্দীক' বা সত্যবাদী রূপে আখ্যায়িত হয়। এটি এমন এক মর্যাদা যেখানে পৌঁছে মানুষ সকল প্রকারের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা নিজের মধ্যে পুঞ্জিভুত করে এবং সেগুলিকে নিজের মধ্যে আকৃষ্ট করে। যেভাবে আতশ কাঁচ সূর্যের রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে, অনুরূপভাবে সিদ্দীকগণ সত্যের পরাকাষ্ঠাকে আকর্ষণ করে।

সত্যের পরাকাষ্ঠা অর্জনের দর্শন

সত্যের পরাকাষ্ঠা অর্জনের দর্শন এই যে, মানুষ যখন নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে নিজের শক্তি ও সামর্থ অনুসারে 'ইইয়াকানাবুদু' উচ্চারণ করে এবং সততা অবলম্বন করে, মিথ্যা পরিহার করে, তখন সে যাবতীয় প্রকারের অপবিত্রতা এবং কলুষতা থেকে দূরে সরে যায় যার সঙ্গে মিথ্যার সংস্রব আছে। সে অঙ্গীকার করে যে মিথ্যা বলবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। এও অঙ্গীকার করে যে, প্রবৃত্তির আবেগ তাকে কখনও মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করবে না- অযথা হিসেবেও নয়, কিম্বা উপকার লাভ ও মন্দকে প্রতিহত করতেও নয়। অর্থাৎ কোনওরূপে, কোনও পরিস্থিতিতেই মিথ্যার আশ্রয় নিবে না। যখন মানুষ এই পর্যায়ের অঙ্গীকার করে, তখন সে ইইয়াকা নাবুদু-কে বিশেষভাবে অনুশীলন করে আর তার এই অনুশীলন হল উচ্চাঙ্গীন ইবাদত। ইইয়াকা নাবুদু-র পর রয়েছে ইইয়াকা নাসতাঈন'। এই শব্দ তার মুখ থেকে বের হোক বা না হোক, কিন্তু সকল কল্যাণের উৎস, সকল সততা ও ন্যায়পরায়ণতার উৎসমুখ আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই সাহায্য করেন এবং সত্যের শ্রেষ্ঠ নীতি এবং অভ্রান্ত সত্য তার সামনে উন্মোচিত হয়। যে ব্যবসায়ী উন্নত নীতি নিয়ে চলে, সততা ও ন্যায় পরায়ণতা বর্জন করে না, সে যদি এক পয়সা নিয়েও ব্যবসা করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক পয়সা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করবেন। এই সত্য চিরপ্রতিষ্ঠিত।

(মালফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩১)

হাশর-এর অর্থ একত্রিত করা আর এই অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা সেই দিনটিকে পূর্বের ও পশ্চাতের সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। হাশর শব্দটি সেই সমাবেশের জন্যও বলা হয় যা নবীদের মাধ্যমে ইহজগতেই সংঘটিত হয়। অর্থাৎ সমস্ত জাতিকে মতবিরোধ ও বিবাদ থেকে বের করে ঐক্যের রজ্জুতে গেঁথে দেওয়া হয়। প্রত্যেক নবীর যুগেই হাশর সংঘটিত হয়। রসুল করীম (সা.)-এর যুগে কি অসাধারণ হাশর সংঘটিত হল, বিভিন্ন চিন্তাধারার মানুষকে এক বাক্যের উপর একত্রিত করা হয়েছে অতঃপর সারা পৃথিবীতে বিস্তার দান করা হয়েছে

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হিজর-এর ২৬ আয়াত وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحۡشُرُهُمۡ ؕ اِنَّهٗ حَكِيۡمٌ عَلِيۡمٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

হাশর-এর অর্থ একত্রিত করা আর এই অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা সেই দিনটিতে পূর্বের ও পশ্চাতের সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। 'হাশর' শব্দটি সেই সমাবেশের জন্যও বলা হয় যা নবীদের মাধ্যমে ইহজগতেই সংঘটিত হয়। অর্থাৎ সমস্ত জাতিকে মতবিরোধ ও বিবাদ থেকে বের করে এনে ঐক্যের রজ্জুতে গেঁথে দেওয়া হয়। প্রত্যেক নবীর যুগেই হাশর সংঘটিত হয়। রসুল করীম (সা.)-এর যুগে কি অসাধারণ হাশর সংঘটিত হল! বিভিন্ন চিন্তাধারার মানুষকে এক বাক্যের উপর একত্রিত করা হল অতঃপর সারা পৃথিবীতে বিস্তার দান করা হল। এই আয়াতে উভয় হাশর-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হাশর এভাবে সংঘটিত হল যে, 'আজ তোমার জাতি তোমার বিরুদ্ধে। কিন্তু একদিন সবাইকে তোমার হাতে একত্রিত করা হবে। হাকীম ও আলীম গুণাবলী দ্বারা বলা হয়েছে যে তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে একত্রিত করা হবে না। কেননা তা প্রজ্ঞার পরিপন্থী। তাৎক্ষণিকভাবে তখনই একত্রিত করা যেত যখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়কে ঐশী প্রতাপে প্রভাবিত করে এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমান বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তাতে লাভ কি হত? এভাবে যারা মুসলমান হত , তারা কোন পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হত না। দ্বিতীয়ত, যে সব ব্যক্তিরা নিজেদের বিশেষ

এরপর শেষের পাতায়......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

হে ইসলামের সুরক্ষাকারীগণ! আমি আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণকারী নকীবদের (নেতাদের) মধ্যে সবচেয়ে স্বল্পবয়স্ক ছিলাম, কিন্তু আমি সবচেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছি। আল্লাহ্ আমার অনুকূলে সিদ্ধান্ত করেছেন আর আমাকে জীবিত রেখেছেন, যার সুবাদে আজ আমি তোমাদের সাথে এসব শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যখনই আমি মু'মিনদের দল নিয়ে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করেছি তখন তারা আমাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র খালি করে দিয়েছে; অর্থাৎ আমরা বিজয়ী হয়েছি আর তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ আমাদের জয়যুক্ত করেছেন।

[হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.)]

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

অন্যান্য বিজিত এলাকার ন্যায় এখানকার (কিনেসরিনের) লোকদের সাথেও উত্তম আচরণ করা হয়েছে এবং সঠিক সাম্যের ভিত্তিতে তাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে কোন ক্ষমতাধর কোন দুর্বলের ওপর অত্যাচার-অনাচার করতে পারত না।

দামেস্ক বিজয়োত্তর ঘটনাবলী, ফেহেল, বিসান, তাবারিয়া, হিমস, মারজুর রউম, হামাত, লাজিকিয়া, কিনসেরিন এবং কায়সারিয়া বিজয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা।

তিনজন মরহুমীনের উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব, যাঁরা হলেন-

মাননীয়া খাদিজা সাহেবা (মৌলভী মহম্মদ আলভী সাহেব, কেরালার সাবেক মুবাল্লিগ-এর সহধর্মিণী), মাননী মালিক সুলতান রশিদ খান সাহেব, সাহেব জেলা আমীর, আটক (কোট ফতেহ খান), মাননী আব্দুল কাইয়ুম সাহেব (ইন্ডোনেশিয়া) এবং মাননীয় দাউদ রাজ্জাকি ইউনুস সাহেব (বেনিন)

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১০ তবুক, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উমর (রা.)'র খিলাফত কালের কথা উল্লেখ করা হচ্ছিল, সে সময় যেসব যুদ্ধ করা হয়েছে মূলতঃ সেগুলোর উল্লেখ করা হচ্ছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে দামেস্ক অবরোধ কয়েক মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে আর তাঁর (রা.) মৃত্যুবরণের কিয়দকাল পর উক্ত যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। যেহেতু সেই যুদ্ধ হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিল তাই যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করা হবে তখন এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

দামেস্ক বিজয়ের পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণনা করছি। দামেস্ক জয় করার পর আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে বিকা'র অভিযানে প্রেরণ করেন। বিকা' হল দামেস্ক, বা'লবাক এবং হিমস্-এর মাঝে অবস্থিত বিস্তৃত এক অঞ্চল যেখানে বহু জনপদ রয়েছে। তিনি (রা.) সেগুলো জয় করেন এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য একটি সেনাদল সম্মুখে প্রেরণ করেন। মেয়সানুন নামক ঝর্ণার উপকণ্ঠে রোমান এবং (মুসলিম) সেনাদলের সংঘর্ষ হয় এবং উভয় দলের মাঝে যুদ্ধ হয়। ঘটনাচক্রে রোমানদের মাঝে সিনান নামক এক ব্যক্তি বৈরুতের উল্টোদিক থেকে এসে মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে সক্ষম হয় এবং বহু-সংখ্যক মুসলমানকে শহীদ করে। বৈরুত সিরিয়ার উপকূলবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। ঐসকল শহীদদের প্রতি আরোপ করে উক্ত ঝর্ণার নাম হয়ে যায় 'আইনুশ শুহাদা' (তথা শহীদদের ঝর্ণা)। আবু উবায়দা (রা.) দামেস্কে ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান'কে নিজ স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দেন এবং ইয়াযিদ, দেহইয়া বিন খালিফা'কে একটি সেনাদলের সাথে তাদমুর প্রেরণ করেন বিজয়ের পথ সুগম করার জন্য। তাদমুর হল সিরিয়ার একটি প্রাচীন এবং বিখ্যাত শহর যেটি আলেপ্পো থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। এখানে যে ইয়াযিদের উল্লেখ করা হচ্ছে তিনি ছিলেন হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর পুত্র।

এমনিভাবে আবু যাহরা কুশায়রী'কে বসনিয়া এবং হাওয়ারান প্রেরণ করেন, কিন্তু সে অঞ্চলের অধিবাসীরা সন্ধিচুক্তি করে ফেলে। বসনিয়া মূলতঃ দামেস্কের নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। দামেস্কের এক বিস্তৃত অঞ্চলের নাম ফারান যেখানে অনেক জনবসতি এবং কৃষিভূমি ছিল। মুসলমানদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার কারণে শারাহবিল বিন হাসানা (রা.) জর্ডানের রাজধানী তাবারিয়া বাদ দিয়ে দেশের অন্য সকল এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে করায়ত্ব করে নেন এবং তাবারিয়াবাসীরা সন্ধিচুক্তি করে নেয়। হযরত খালিদও সফলতা লাভ করে বিকা' অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। বা'লবাকের অধিবাসীরা তাঁর সাথে সমঝোতা করে নেয় আর তিনি তাদেরকে সন্ধিচুক্তি লিখে দেন।

(সৈয়্যদানা উমর বিন খাত্তাব, শাখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা- আসসালাবী, পৃ: ৭৩০) (মুজামুল বালদান, ১ম খন্ড, পৃ: ৪০২,৫৫৭,৬২৩) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০, ৩৬৪)

ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী বা'লবাকও দামেস্ক থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত এক প্রাচীন শহর। (মুজামুল বালদান, ১ম খন্ড, পৃ: ৫৩৭-৫৩৮)

এখানে দিনের দূরত্ব বলতে তৎকালীন যুগের সফরের মাধ্যম অর্থাৎ উট বা ঘোড়ায় আরোহণ করে একদিনে অতিক্রান্ত দূরত্বকে বোঝায়।

ফেহেল একটি জনপদের নাম যেটি চৌদ্দ হিজরীতে বিজিত হয়। হযরত আবু উবায়দা (রা.), হযরত উমর (রা.)-এর উদ্দেশ্যে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, আমি অবগত হয়েছি, হিরাক্লিয়াস হিম্সে অবস্থান করছে আর সেখান থেকে দামেস্কে সৈন্যবাহিনী রওনা করছে। কিন্তু আমি প্রথমে দামেস্ক আক্রমণ করব নাকি ফেহেল- এই সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেহেলও সিরিয়ার একটি জনপদের নাম। হযরত উমর (রা.) উক্ত পত্রের উত্তরে লেখেন, প্রথমে দামেস্ক আক্রমণ করে বিজয় অর্জন কর, কেননা সেটি সিরিয়ার দুর্গ এবং রাজধানী। পাশাপাশি ফেহেলেও অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ কর যেন তাদেরকে তোমাদের দিকে আসতে না দেয়। যদি দামেস্ক বিজয়ের পূর্বেই ফেহেল বিজয় হয় তাহলে তা উত্তম, অন্যথায় দামেস্ক জয়ের পর কিছু সংখ্যক সেনা সেখানে রেখে সমস্ত নেতাদেরকে নিয়ে তুমি ফেহেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। যদি আল্লাহ্ তোমাদের হাতে ফেহেল বিজিত করেন তাহলে খালিদ আর তুমি হিমস্ চলে যেও। আর শারাহবিল ও আমরকে জর্ডান এবং ফিলিস্তিন পাঠিয়ে দিও। হযরত উমর (রা.)-এর পত্র পাওয়া মাত্রই হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) সেনাবাহিনীর দশজন কমান্ডারকে, যাদের মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবুল আ'ওয়ার সুলমী, ফেহেল পাঠিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)সহ দামেস্ক রওনা হয়ে গেলেন। রোমান সেনাবাহিনী যখন মুসলিম সেনাবাহিনীকে নিজেদের দিকে অগ্রসর হতে দেখল তখন নিজেদের চতুর্দিকের জমিতে তাবারিয়া-সাগর ও জর্ডান নদীর পানি ছেড়ে দিল, যার ফলে পুরো এলাকা চোরাবালিবহুল হয়ে গেল আর সেটা অতিক্রম করা দুষ্কর হয়ে পড়ল।

(সৈয়্যদানা উমর ফারুক আযাম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ১৯-১৯৫) (আল ফারুক, প্রণেতা-আল্লামা শিবলি, পৃ: ১১৪) (মুজামুল বালদান, ১ম

খন্ড, পৃ: ৪০২, ৫৫৭, ৬২৩) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০, ৩৬৪)

যাহোক হিরাক্লিয়াস দামেস্কের সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিল তারাও দামেস্ক পৌঁছতে পারল না। পানি ছেড়ে দেওয়ার কারণে সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মুসলমানরা থাকল অবিচল। মুসলমানদের অবিচলতা দেখে খ্রিস্টানরা সন্ধি করতে সম্মত হল। আর আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে দূত হিসেবে কাউকে পাঠানোর অনুরোধ করল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.)-কে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) তাদের সামনে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরলেন। কিন্তু শত্রুরা তা গ্রহণ করে নি। অন্যান্য বিষয়ের সাথে রোমানরা হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.)-কে প্রস্তাব দিল যে আমরা তোমাদের বলকা এবং জর্ডানের সাথে তোমাদের ভূমিসংলগ্ন অঞ্চলটি দিয়ে দিচ্ছি; তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে পারস্যে চলে যাও। প্রথমে নিজেরাই সেনা-সমাবেশ করছিল; কিন্তু যখন দেখল যে পরাজয়ের আশঙ্কা আছে, তখন এ প্রস্তাব উপস্থাপন করল।হযরত মু'আয বিন জাবাল তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন এবং উঠে চলে আসলেন। রোমানরা সরাসরি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে কথা বলতে চাইল। এ উদ্দেশ্যে একজন বিশেষ দূত প্রেরণ করল। যখন সেই দূত ইসলামী সেনাশিবিরে এসে উপস্থিত হল তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) মাটিতে বসে ছিলেন আর হাতে তীর ছিল যা তিনি উল্টে-পাল্টে দেখছিলেন। দূত ভেবেছিল ইসলামী সেনাপতি বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ আসনে সমাসীন হবেন,আর সেটিই তাকে চেনার মাধ্যম হবে। কিন্তু সে যেদিকে তাকাচ্ছিল সবাইকে একই রকম দেখতে পাচ্ছিল। অবশেষে কিছুটা অস্বস্তি ও ভীতি নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সেনাপতি কে? লোকেরা হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করল। সে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, সত্যিই কি তুমি সেনাপতি? হযরত আবু উবায়দা (রা.) বললেন, হ্যাঁ। দূত বলল, আমরা তোমাদের সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে মাথাপিছু ২ আশরাফি (স্বর্ণমুদ্রা) দিব; তোমরা এখান থেকে চলে যাও। হযরত আবু উবায়দা (রা.) অস্বীকৃতি জানালেন। দূত অসন্তুষ্ট হল এবং উঠে চলে গেল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) তার আচরণ দেখে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুতি নেওয়ার আদেশ দিলেন আর সমস্ত পরিস্থিতি হযরত উমর (রা.)-কে লিখে পাঠালেন। হযরত উমর (রা.) আক্রমণ করার অনুমতি দিলেন, কেননা তাদের বিরুদ্ধে রোমান সেনারা জড়ো হচ্ছিল। তিনি (রা.) সাহস জোগালেন যে, দৃঢ়চিত্ত থাক; খোদা তোমাদের সাহায্যকারী হবেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সেদিনই আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু রোমানরা মোকাবিলার জন্য আসে নি। পরের দিন সকালে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) শুধুমাত্র অশ্বারোহীদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। রোমান সেনাবাহিনী প্রস্তুত ছিল, উভয়পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হল। মুসলমান সেনাবাহিনীর অবিচলতা দেখে রোমান সেনাপ্রধান যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন মনে করল আর ফিরে যেতে চাইল। হযরত খালিদ উচ্চস্বরে বললেন, রোমানরা নিজেদের শক্তি খরচ করে দেখিয়েছে, এখন আমাদের পালা। এর সাথেই মুসলমানরা অকস্মাৎ আক্রমণ করল আর রোমানদের পিছু হটিয়ে দিল। খ্রিষ্টানরা সাহায্যের আশায় যুদ্ধকে প্রলম্বিত করছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাদের কৌশল বুঝে ফেললেন। তখন তিনি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বললেন, রোমানরা আমাদের ভয়ে ত্রস্ত, এখনই আক্রমণের সময়। তাই তখনই ঘোষণা করা হলো, আগামী দিন আক্রমণ করা হবে, সেনাবাহিনী যেন প্রস্তুত থাকে। রাতের শেষ প্রহরে হযরত আবু উবায়দা (রা.) সেনাবাহিনীকে সারিবদ্ধ করলেন। রোমান সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার। হযরত উমর (রা.)-এর জীবনী লেখকদের মাঝে দু 'জন হেয়কেল ও সালাবী এই সংখ্যা আশি হাজার থেকে এক লক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। যাহোক, এক ঘন্টা ভয়াবহ যুদ্ধ হল। এরপর রোমান সেনাবাহিনীর পা হড়কে যায় আর তারা দিশেহারা হয়ে পলায়ন করল। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) নির্দেশ প্রদান করেন যে, সমস্ত দখলকৃত ভূখন্ড তাদের মালিকদের অধীনেই থাকবে। কোন ভূখণ্ড কারও কাছ থেকে নেওয়া হবে না এবং মানুষের প্রাণ, ধনসম্পদ, জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি এবং উপাসনালয় সবকিছুই সুরক্ষিত থাকবে। শুধুমাত্র মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি নেওয়া হবে। (সৈয়্যদানা উমর বিন খাত্তাব, শাখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা- আসসালাবী, পৃ: ৭৩০) (আল ফারুক, প্রণেতা- আল্লামা শিবলি, পৃ: ১১৪-১১৮) (সৈয়্যদানা উমর ফারুক আযম, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, (উর্দু অনুবাদ) পৃ: ২১৩)

যদি কোন জমি নিতে হয় তবে কেবল মসজিদের জন্য নেওয়া হবে, অবশিষ্ট জায়গা-জমি তাদের মালিকদের নিকটই থাকবে। অতঃপর রয়েছে বে'সান বিজয়ের বৃত্তান্ত। ফেহেল যুদ্ধের অবসান হলে শারাহ্বিল নিজ সৈন্য-সামন্ত ও আমরকে নিয়ে বে'সান অধিবাসীদের অভিমুখে অগ্রসর হন এবং তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। সে সময় আবুল আ'ওয়ার ও তার সাথে আরও কতিপয় নেতা তাবারিয়াহ্ অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। বে'সান তাবারিয়াহ্'র দক্ষিণে ১৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি জনপদ। জর্ডানের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে দামেস্ক এবং পরবর্তী আরও কয়েকটি অভিযানে রোমানদের উপুর্যপুরী পরাজয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। আর লোকজন জেনে গিয়েছিল যে, শারাহ্বিল এবং তার সাথে আমর বিন আস, হারেস বিন হিশাম ও সাহল বিন আমর নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে বে'সান দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে। এজন্য সর্বত্র লোকজন দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শারাহ্বিল বে'সান পৌঁছে কয়েকদিন একে অবরোধ করে রাখেন। পরবর্তীতে সেখানকার কিছু লোক লড়াই করার জন্য বের হয়ে আসে। মুসলমনারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাজিত করে, অবশিষ্ট লোকজন সমঝোতার আবেদন করে, যা মুসলমানরা দামেস্ক বিজয়ের জন্য নির্ধারিত শর্তে মেনে নেয়। অর্থাৎ দামেস্ক বিজয়ের মধ্যে যে সকল শর্তাবলী ছিল, সেগুলোর ভিত্তিতে এটিও গৃহীত হয়। (তারিখে তাবারী (উর্দু), ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৬) (আল ফারুক, প্রণেতা-শিবলী নোমানী, পৃ: ১১৪)

অতঃপর তাবারিয়াহ্ বিজয়ের ঘটনা। যখন তাবরিয়াহ্'র অধিবাসীরা বে'সান বিজয় এবং এর সন্ধি-চুক্তি সম্পর্কে অবগত হয়, তখন তারা আবুল আ'ওয়ারের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে যে, তাদেরকে যেন শারাহ্বিলের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। আবুল আ'ওয়ার তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। অতএব তাবারিয়াহ্ ও বে'সানবাসীদের সাথে দামেস্ক বিজয়ের জন্য নির্ধারিত শর্তে সমঝোতা হয়ে যায় এবং এই সিদ্ধান্ত ও গৃহীত হয় যে, শহর ও এর নিকটবর্তী গ্রামীণ এলাকার সকল ঘর-বাড়ির মধ্যে অর্ধেক মুসলমানদের জন্য খালি করে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক অংশে স্বয়ং রোমানরা বসবাস করবে ও বাৎসরিক শতকরা এক দিনার এবং কৃষি উৎপাদন হতে নির্দিষ্ট অংশ আদায় করবে। এরপর মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও তাদের সৈন্যবাহিনীরা সেই জনবসতিতে বসতি স্থাপন করে এবং জর্ডানের সন্ধি-চুক্তিও পূর্ণতা লাভ করে এবং সকল সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনী জর্ডানের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলে। আর বিজয়ের সুসংবাদ হযরত উমর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। [তারিখে তাবারী, (উর্দু অনুবাদ), ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৬-২১৭]

এরপর রয়েছে হিম্স বিজয়। এটি ১৪ হিজরীতে সংঘটিত হয়। এরপর হযরত আবু উবায়দা সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর হিম্সের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন, যা সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরত্ব বহন করতো। হিম্স, দামেস্ক ও আলেপ্পোর মধ্যে অবস্থিত সিরিয়ার একটি শহর। হিম্সে একটি বড় গির্জা ছিল, যা দর্শনের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসত এবং এখানে উপাসনা করাকে গর্বের বিষয় বলে জ্ঞান করত। যাহোক,হিম্সের নিকটবর্তী অঞ্চলে রোমানরা নিজে থেকেই যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। রোমানরাই সামনে অগ্রসর হয়। অতএব একটি বড় সৈন্যবাহিনী হিম্স থেকে অগ্রসর হয়ে জুসিয়াতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু তারা পরাজিত হয়। হযরত আবু উবায়দা ও হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ হিম্সে পৌঁছে শহর অবরুদ্ধ করে ফেলে। প্রচন্ড শীতকাল ছিল। রোমানরা নিশ্চিত ছিল যে, মুসলমানরা খোলা ময়দানে দীর্ঘক্ষণ লড়াই করতে পারবে না। উপরন্তু হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে সাহায্য লাভেরও আশা ছিল; সে জাযিরা থেকে একটি সৈন্যবাহিনীও প্রেরণ করে। কিন্তু হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, যিনি ইরাক অভিযানের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন, একটি সেনাদল সেই বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যারা সেই সৈন্যবাহিনীকে সেখানেই থামিয়ে দেয়। (আল ফারুক, প্রণেতা- মৌলানা শিবলী নোমানী, পৃ: ১১৮-১১৯) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৭)

ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে, রোমানদের পায়ে চামড়ার মোজা ছিল, তারপরও তাদের পা শীতে জমে যেত; অথচ সাহাবীদের পায়ে বা মুসলমান সৈন্যবাহিনীর পায়ে সামান্য জুতো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। (সৈয়্যদানা উমর বিন খাত্তাব, শাখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা-আসসালাবী, পৃ: ৭৩৪)

হিরাক্লিয়াস হিমস্বাসীদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও তাদেরকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে স্বয়ং রাওয়াহা চলে যায়। প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেই সেখান থেকে পশ্চাদগমণ করে। হিম্সবাসীরা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে বসে থাকে। যেদিন প্রচণ্ড শীত থাকতো তারা কেবল সেদিনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হতো। রোমানরা হিরাক্লিয়াসের সাহায্যের অপেক্ষায় ছিল আর চাইতো, শীতের কাছে হার মেনে মুসলমানরা যেন পালিয়ে যায়। কিন্তু মুসলমানরা অবিচলতা দেখিয়েছে এবং হিরাক্লিয়াসের সাহায্যও তারা অর্থাৎ হিমসবাসীরা পায় নি। এদিকে শীতকাল অতিবাহিত হয়ে যায়। তখন হিমসবাসীরা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, এখন এদের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব নয় ফলে, তারা সন্ধির আবেদন করে। মুসলমানরা আবেদন গ্রহণ করে নেয় এবং শহরের সকল দালান-কোঠা শহরবাসীদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, আর তাদের সাথে দামেস্কের ন্যায় কর ও জিযিয়ার বিনিময়ে সন্ধি করে নেওয়া হয়। হযরত আবু উবায়দা হযরত উমর (রা.)-কে পুরো ঘটনা ও বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবগত করেন। এর উত্তরে হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে নির্দেশনা আসে যে, তুমি এখন সেখানেই অবস্থান কর এবং সিরিয়ার শক্তিধর আরব গোত্রগুলোকে তোমার পতাকাতলে সমবেত কর। আমিও এখান থেকে প্রতিনিয়ত সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ।

(সৈয়্যদানা উমর ফারুক আযম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩৩১-৩৩২) মারজুর রোম নামে একটি জায়গা রয়েছে। এবছরই মারজুর রোমের ঘটনা ঘটে। মারজুর রোম হলো দামেস্কের নিকটবর্তী একটি স্থান। ঘটনাটি হলো, হযরত আবু উবায়দা ফেহেল থেকে হিমস যাওয়ার জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের সাথে রওয়ানা হন। যুল কালা' নামক স্থানে সকলে শিবির স্থাপন

করে। তাদের এই গতিবিধি সম্পর্কে হিরাক্লিয়াস অবগত হয়ে যায়। এতে সে তুযরাবিতরীক-কে প্রেরণ করে। সে মারজে দামেস্ক এবং এর পশ্চিম দিকে অবস্থান গ্রহণ করে। আবু উবায়দা মারজুর রোম এবং এর সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তখন মুসলমানদের অবস্থা এমন ছিল যে, শীতকাল এসে পড়েছিল এবং তাদের দেহ ছিল ক্ষতবিক্ষত। তারা যখন মারজুর রোমে পেঁ ছে তখন শানস রুমী-ও সেখানে চলে আসে এবং তুযরার নিকটেই অশ্বারোহীদের নিয়ে শিবির স্থাপন করে। এই শানস মূলত তুযরার সাহায্য এবং হিমসবাসীদের রক্ষা করার জন্য এসেছিল। সে এক প্রান্তে নিজ সৈন্যবাহিনীর সাথে অবস্থান নেয়। রাত ঘনিয়ে এলে এদের দ্বিতীয় সেনাপতি তুযরা সেখান থেকে যাত্রা করে আর এরা চলে যাওয়ার কারণে সেই জায়গা খালি হয়ে যায়। তুযরার বিপরীতে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ ছিলেন আর শানসের বিপরীতে হযরত আবু উবায়দা ছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ যখন জানতে পারলেন যে, তুযরা এখান থেকে দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেও তখন হযরত খালেদ এবং হযরত আবু উবায়দা এ সিদ্ধান্তে একমত হন যে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ তুযরার পশ্চাদ্ধাবন করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ অশ্বারোহীদের একটি সৈন্যদল নিয়ে সে রাতেই তুযরার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য রওয়ানা হন। এদিকে ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানও তুযরার গতিবিধি সম্পর্কে জেনে গিয়েছিলেন, তাই তিনি তুযরাকে প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসেন। উভয় সৈন্যবাহীর মাঝে যুদ্ধ ছিল তুঙ্গে। উভয় দলের মাঝে যখন যুদ্ধ চলছিল ঠিক তখন পেছন থেকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ তার সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে পৌছে যান আর তুযরার পেছন দিক থেকে তিনি আক্রমণ করে বসেন। ফলে লাশের স্তুপ পড়ে যায়, শত্রুরা অগ্রপশ্চাৎ উভয় দিক থেকে মারা পড়ে। মুসলমানরা তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। তাদের মধ্য থেকে কেবল তারাই প্রাণে রক্ষা পেয়েছে যারা পলায়ন করেছে। মুসলমানরা এই যুদ্ধে যেসব যুদ্ধলব্ধসম্পদ পেয়েছে সেগুলোতে বাহনের পশু, অস্ত্র, পোশাক প্রভৃতি ছিল। এগুলোকে হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান নিজ সৈন্যবাহিনী ও হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এরপর হযরত ইয়াযিদ দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন আর হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ হযরত আবু উবায়দার কাছে ফেরত চলে আসেন। ইসলামের ইতিহাসে যে ইয়াযিদের দুর্নাম রয়েছে সে ছিল মুয়াবিয়ার ছেলে ইয়াযিদ, আর এখানে উল্লেখিত ইয়াযিদ হলো আবু সুফিয়ানের পুত্র। রোমানদের নেতা তুযরাকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ হত্যা করেছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ যখন তুযরার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য রওয়ানা হন তখন হযরত আবু উবায়দা শানসের মোকাবেলা করেন। উভয় দলের মাঝে মারজুর রোমে যুদ্ধ বেধে যায়। ইসলামী সেনাবাহিনী অনেককে হত্যা করে এবং আবু উবায়দা শানস-কে হত্যা করেন। মারজুর রোম শত্রুদের লাশে ভরে যায়। সেই লাশগুলোর কারণে সেই স্থানটি দুর্গন্ধময় হয়ে গিয়েছিল। রোমানদের মধ্যে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা বেঁচে গিয়েছিল, অবশিষ্ট কেউ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারে নি। মুসলমানরা পলায়নকারীদের হিমস পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করে। (আল কামিলু ফিততারিখ, ২য় খন্ড, পৃ: ৩২১)

এরপর হযরত আবু উবায়দা সেনাবাহিনী নিয়ে হাম্মাদের দিকে রওনা হন। হাম্মাদও সিরিয়ার একটি প্রাচীন শহর যা তৎকালীন দামেস্ক থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। হাম্মাদবাসী তাদের সামনে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, আত্মসমর্পন করে। শাহযারের অধিবাসীরা যখন জানতে পারল তখন তারাও হাম্মাদবাসীদের ন্যায় সন্ধিচুক্তি করে নিল। শাহযার, হাম্মাদ শহর থেকে অর্ধদিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রাম ছিল। এরপর হযরত আবু উবায়দা সালামিয়া জয় করেন। সালামিয়াও হাম্মাদ থেকে দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি জনপদ ছিল।

(সৈয়্যদানা উমর ফারুক আযাম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩৩৩) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০, ৩৬৪)

এরপর ১৪হিজরিতে লাযেকিয়া বিজিত হয়। ইসলামি সেনাবাহিনী হযরত আবু উবায়দার নেতৃত্বে লাযেকিয়ার দিকে অগ্রসর হয় যা সিরিয়ার একটি শহর এবং সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত, আর হিমসের উপশহর হিসাবে এটিকে গণ্য করা হয়। লাযেকিয়াবাসীরা ইসলামি সেনাবাহিনীকে তাদের দিকে অগ্রসর হতে দেখে দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং শহরের ফটকগুলোকে বন্ধ করে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা নিশ্চিত ছিল যে, মুসলমানরা যদি তাদেরকে অবরোধ করে তাহলে তারা লড়াই করার সামর্থ রাখে, আর ততক্ষণে সমুদ্রপথে তাদের কাছে হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে সাহায্য এসে যাবে। মুসলমানরা এই শহরকে অবরুদ্ধ করে রাখে। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এই শহরটি অত্যন্ত দৃঢ় ছিল এবং সেনাছাউনির কারণে যথেষ্ট বিখ্যাত ছিল। হযরত আবু উবায়দা একে জয় করার একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করেন, কেননা তিনি রণকৌশলে দক্ষ ছিলেন। তিনি অনুভব করলেন, এটি জয় করা অনেক কঠিন হবে। যদি এটিকে জয়ের জন্য তিনি এখানে শিবির স্থাপন করেন তাহলে সেখানে অবস্থানকাল অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। আর অবরোধ দীর্ঘ হলে হতে পারে যে, শত্রুপক্ষ তাদের কাছে সাহায্যকারী সৈন্য পাঠিয়ে দিবে, ফলে এখান থেকে বিফল হয়ে ফিরে যেতে হতে পারে। অথবা অবরোধ বেশি দীর্ঘ করলে আনতাকিয়া যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। তিনি এক রাতে রণক্ষেত্রে অনেকগুলো এমন গর্ত খনন করার নির্দেশ দিলেন যেগুলোতে অনায়াসে একজন অশ্বারোহী ঘোড়াসহ লুকিয়ে থাকতে পারে। এরপর সেগুলোকে ঘাস দিয়ে ঢেকে দেন এবং সকালে অবরোধ উঠিয়ে হিমসের দিকে যাত্রা করেন। নগরবাসীরা অবরোধ উঠে যেতে দেখে আনন্দিত হয় এবং নিশ্চিন্তে শহরের ফটকগুলো খুলে দেয়। অন্যদিকে হযরত আবু উবায়দা রাতারাতি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন এবং সেসব গুহাকৃতির গর্তে লুকিয়ে থাকেন। সকালে যখন তারা শহরের ফটকগুলো খুলে দেয় তখন মুসলমানরা তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। কিছু মুসলমান শহরের ফটকের দখল নিয়ে ফেলে। যারা দুর্গের বাইরে ছিল তারা পলায়ন করাটাই নিজেদের জন্য মঙ্গালজনক বলে মনে করে, আর যারা শহরে ছিল তাদের মাঝে এক তীব্র ত্রাসের সঞ্চার হয়। তাই যারা শহরে ছিল তারা সবাই মুক্তির পথ অন্বেষণ করতে থাকে। তাদের জন্য আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং তারা সন্ধিচুক্তি করে নিল এবং পলাতকরা আশ্রয় প্রার্থনা করল। মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করে শহর জয় করে নিল। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ জিযিয়ার বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করে নিলেন এবং তাদের গির্জা তাদের দায়িত্বেই থাকতে দিলেন। পরবর্তীতে মুসলমানরা এর নিকটেই তাদের একটি মসজিদ নির্মাণ করে নিল।

(সৈয়্যদানা উমর ফারুক আযম, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদ- ৩৩৩-৩৩৪) (আল ফারুক, প্রণেতা- আল্লামা শিবলি, পৃ: ১১৮-১১৯)

সেই বিজয়ের পর হযরত উমর লিখলেন যে, এ বছর যেন আর অভিযান পরিচালনা করা না হয়।

এরপর রয়েছে কিনেসরিনের বিজয় যা হয়েছে ১৫হিজরি সনে। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে কিনেসরিন অভিমুখে করেন যা আলেপ্পোর একটি মনোরম শহর ছিল। আলেপ্পোর পথে পাহাড়ের মাঝখানে কিনেসরিনের একটি দুর্গ ছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ হাযের নামক স্থানের কাছে পৌঁছলেন। হাযেরও আলেপ্পোর নিকটবর্তী একটি স্থান। সেখানে রোমানরা মিনাসের নেতৃত্বে তার বিপক্ষে লড়াই করতে আসে। হিরাক্লিয়াসের পর রোমানদের সবচেয়ে বড় সেনাপ্রধান মিনাস-ই ছিল। যাহোক, স্থানীয়রা এবং তাদের সাথে বসবাসকারী আরব খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে। আরবদের রীতি ছিল যে, তারা শহরের নিরাপত্তার জন্য শহরের বাইরে গিয়ে শিবির স্থাপন করত। সুতরাং এই খ্রিষ্টান আরবরাও এই নীতি অনুযায়ী বাইরে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। প্রচন্ড লড়াইয়ের পর হযরত খালেদ রোমানদের অনেক সৈন্যকে হত্যা করেন এবং তাদের নেতা মিনাসকেও হত্যা করেন। এলাকার লোকেরা খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা আরব আর আমরা যুদ্ধ করার জন্য সম্মতই ছিলাম না। আমাদেরকে এ যুদ্ধে বাধ্য করা হয়েছে। তাই আমাদেরকে ক্ষমা করা হোক। তখন হযরত খালিদ তাদের অজুহাত মেনে নেন এবং তাদের ওপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকেন।

কিছু রোমান পালিয়ে কিনেসরিনের দুর্গে আশ্রয় নেয়। হযরত খালেদ তাদের পিছু নেন, কিন্তু যখন তিনি কিনেসরিন পৌছেন ততক্ষণে রোমানরা শহরের ফটকগুলো বন্ধ করে ফেলেছিল। এটি দেখে হযরত খালেদ তাদের কাছে এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তোমরা যদি মেঘে গিয়েও আত্মগোপন কর, তবুও আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবেন অথবা তোমাদেরকে আমাদের কাছে নিক্ষেপ করবেন। কিছুদিন তারা দুর্গেই অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে,কিন্তু অবশেষে কিনেসরিনবাসীরা নিশ্চিত হয়ে যায়, এখন মুক্তির আর কোন উপায় নেই । সুতরাং তারা আবেদন করে, হিমসের অনুরূপ সন্ধিচুক্তির শর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হোক। কিন্তু প্রথমে তারা যে আদেশ অমান্য করেছিল তার প্রেক্ষিতে হযরত খালিদ তাদেরকে আদেশ অমান্যের শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। এজন্য হযরত খালেদ শহরকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন বিষয়ে সম্মত ছিলেন না। কিনেসরিনবাসীরা তাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে নিয়তির হাতে ছেড়ে আনতাকিয়া পলায়ন করে। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ কিনেসরিন পৌঁছে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সঠিক ও ন্যায়সম্মত পেলেন এবং শহরের দুর্গ ও প্রাচীরসমূহ গুঁ ড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি অনুভব করলেন যে, ন্যায়বিচারের পাশাপাশি দয়ার আচরণও করা উচিত। প্রথমে শত্রুর সাথে যা করা হয়েছে তা ন্যায়বিচার ছিল। এখন মুসলমানদের দয়ার আচরণও করা উচিত। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হয়ে শহরবাসীকে তাদের আবেদন অনুযায়ী নিরাপত্তা দিয়ে দেন এবং এটিও বলা হয় যে, শহরের গির্জা এবং ঘরবাড়ি বণ্টন করে দেওয়া হল; অর্ধেক অংশের ওপর মুসলমানরা কর্তৃত্ব নেয় আর অর্ধেক অংশ তাদের কাছেই রেখে দেওয়া হয়। এমন একটি বর্ণনাও রয়েছে যে, শহরের কিছু ভূমি নিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং অবশিষ্ট সবকিছু যথারীতি এলাকাবাসীদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হয়। যারা আনতাকিয়া পলায়ন করেছিল তারাও জিযিয়া প্রদানের শর্ত গ্রহণ করে ফিরে এসেছিল। অন্যান্য বিজিত এলাকার ন্যায় এখানকার লোকদের সাথেও উত্তম আচরণ করা হয়েছে এবং সঠিক সাম্যের ভিত্তিতে তাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে কোন ক্ষমতাধর কোন দুর্বলের ওপর অত্যাচার-অনাচার করতে পারত না।

(সৈয়্যদানা উমর ফারুক আযম, প্রণেতা- মহম্মদ হোনে হ্যায়কার, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৩৩৩-৩৩৯) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩৮) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৫)

এরপর রয়েছে কায়সারিয়া বিজয়। এটিও ১৫ হিজরি সনে সংঘটিত হয়। কায়সারিয়া সিরিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী শহর যা তাবারিয়া থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত। এই যুদ্ধ কোন বছরে হয়েছে এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। একটি হল, ১৫হিজরি সনে, অন্য বক্তব্য অনুযায়ী ১৬হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে, আর তৃতীয় একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী ১৯হিজরি এবং চতুর্থ বর্ণনানুযায়ী ২০হিজরি সনে সংঘটিত হয়েছে।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫১১) (মুজামুল বালদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৭৮)

যাহোক, যখন হযরত আবু উবায়দা বিজয়াভিযান নিয়ে উত্তর রোমে অগ্রসর হচ্ছিলেন, হযরত আমর বিন আস এবং হযরত শারাহবিল বিন হাসানা রোমের সেই সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিলেন যারা ফিলিস্তিনে একত্রিত ছিল এবং তাদেরকে পরাজিত করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এটি কোন সহজ কাজ ছিল না। এই সৈন্যবাহিনী সংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক শক্তিশালী ছিল এবং তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল রোমের সবচেয়ে বড় সেনাপতি আতরাবুন, যার দূরদৃষ্টি এবং সামরিক বুৎপত্তির ক্ষেত্রে সেই রাজত্বে তার কোন জুড়ি ছিল না। সে সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবল যেন নেতৃত্বের লাগাম একমাত্র তার হাতেই থাকে। আর যদি তার সেনাবাহিনীর কোন অংশের উপর আরবরা জয়ীও হয় সেক্ষেত্রে যেন অন্য অংশ প্রভাবিত না হয়। সুতরাং সে রামাল্লা এবং অনুরূপভাবে এলিয়ায় একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিযুক্ত করে এবং এদের সাহায্যের জন্য গাযা, সাবাস্তিয়া, নাবলুস, লুদ ও ইয়াফায় সেনা মোতায়েন করে। এরপর আরবদের আগমনের অপেক্ষায় থাকে। তার বিশ্বাস ছিল সে আরবদের পরাজিত এবং তাদের শক্তি ধুলিস্যাৎ করার শক্তি ও ক্ষমতা রাখে। হযরত আমর বিন আস (রা.) পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা অনুভব করেন। তিনি চিন্তা করেন, তিনি যদি তার সমস্ত সেনাদল নিয়ে আতরাবুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন তাহলে রোমান সৈন্যরা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবেন না, বরং হতে পারে রোমনরাই তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে। অতএব হযরত উমর (রা.) কে তিনি পত্র লিখলে তিনি (রা.) ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে নির্দেশ দেন, আপনার ভাই মুয়াবিয়াকে আপনি কায়সারিয়া বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করুন যেন আতরাবুনের কাছে সমুদ্রপথে সাহায্য পৌঁছতে না পারে। হযরত উমর (রা.) আমীর মুয়াবিয়ার নামে প্রেরিত পত্রে লিখেন, আমি আপনাকে কায়সারিয়ার আমীর নিযুক্ত করছি। সেখানে যান এবং তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করুন আর ***'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।*** এবং ***আল্লাহু রাব্বুনা ওয়া সিকাতুনা ওয়া রিজাউনা ওয়া মওলানা। নে'মাল মওলা ওয়া নে'মান নাসীর'*** অজস্র ধারায় পড়তে থাকুন। অর্থাৎ পাপ থেকে বাঁচার এবং পুণ্যকর্ম করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্ তা'লাই দান করেন, যিনি অতীব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং অতীব মহান। আর আল্লাহ্ আমাদের প্রভু -প্রতিপালক, নির্ভরস্থল, আমাদের ভরসাস্থল এবং তিনিই আমাদের অভিভাবক; কতইনা উত্তম অভিভাবক আর কতইনা উত্তম সাহায্যকারী।

আল ফারুক পুস্তকে লিখা রয়েছে, হযরত আমর বিন আস (রা.) ১৩ হিজরীতে প্রথমবার কায়সারিয়ার ওপর অভিযান পরিচালনা করেন এবং অনেক দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখেন কিন্তু বিজয় লাভ করা সম্ভব হয় নি। আবু উবায়দা (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.) ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে তার স্থলে নিযুক্ত করেন এবং কায়সারিয়ার অভিযানে বের হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি ১৭ হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়ে শহর অবরোধ করেন। কিন্তু ১৮ হিজরী সনে অসুস্থ হলে তিনি তার ভাই আমীর মুয়াবিয়াকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে দামেস্কে চলে আসেন আর সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

কায়সারিয়া লেভানটাইন সাগরের উপকূলে অবস্থিত আর (একে) ফিলিস্তিনের অঞ্চলগুলোর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। বর্তমানে এটি জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু সেই যুগে অনেক বড় শহর ছিল। বালাযারীর ভাষ্যমতে এখানে ৩০০ বাজার ছিল, যার প্রতিরক্ষায় অনেক বড় একটি রোমান সেনাদল নিযুক্ত ছিল। এখানে তাদের একটি অত্যন্ত মজবুত ও ভয়ঙ্কর সীমান্তবর্তী দুর্গ ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কায়সারিয়ায় পৌঁছার পর একে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। রোমানরা ইসলামী সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করতো, কিন্তু পরাস্ত হয়ে তারা আবার দুর্গে ফিরে যেত। অবশেষে অবরোধ দীর্ঘ হয়ে গেলে একদিন তারা 'হয় মারব না হয় মরব'- এমন পণ করে বেরিয়ে আসে, কিন্তু পরাজয় বরণ করে আর এত মারাত্মকভাবে পরাজয় বরণ করে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের ৮০ হাজার সৈন্য মারা যায়। পরাজয় ও পলায়নের পর এ সংখ্যা এক লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। কায়সারিয়া বিজয় এবং এর সেনাদলের ধ্বংসের পর মুসলমানরা সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয়ে যায় আর সেদিক থেকে রোমানদের সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে যায়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশের সাথে বিজয়ের সংবাদ হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন।

অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) ব্যাপক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অবরোধ করেন। শহরের অধিবাসীরা বেশ কয়েকবার দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করে, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হয়; তথাপি শহরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। একদিন ইউসুফ নামের এক ইহুদি আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট এসে একটি সুড়ঙ্গের সন্ধান দেয় যা শহরের ভেতর দিয়ে দুর্গের দরজা পর্যন্ত গিয়েছিল। অতএব কিছু সংখ্যক সাহসী যোদ্ধা এই পথ ধরে দুর্গের ভিতর গিয়ে দরজা খুলে দেয় এবং একই সাথে পুরো সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে আর বিজয় অর্জিত হয়।

হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) যিনি বদরী সাহাবীদের মাঝে অন্যতম ছিলেন, তিনিও এযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কায়সারিয়ার যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের ঘটনা এভাবে পাওয়া যায় যে, কায়সারিয়ার অবরুদ্ধ অঞ্চলে হযরত উবাদা বিন সামেত ইসলামী সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি তাঁর সেনাদলকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে তাদেরকে পাপ থেকে বিরত থাকার এবং আত্মবিশ্লেষণের নির্দেশ দেন। এরপর তিনি পুনরায় সৈন্যদের একটি দল নিয়ে সামনে অগ্রসর হন এবং অনেক রোমান সৈন্যকে হত্যা করেন। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যে তিনি সম্পূর্ণ সফল হতে পারেন নি। তাই পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরে আসেন এবং নিজ সাথীদের প্রাণপণ যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন ও নিজের সাথে এত বড় সেনাদল নিয়ে আক্রমণ করা সত্ত্বেও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফেরার কারণে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, হে ইসলামের সুরক্ষাকারীগণ! আমি আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণকারী নকীবদের (নেতাদের) মধ্যে সবচেয়ে স্বল্পবয়স্ক ছিলাম, কিন্তু আমি সবচেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছি। আল্লাহ্ আমার অনুকূলে সিদ্ধান্ত করেছেন আর আমাকে জীবিত রেখেছেন, যার সুবাদে আজ আমি তোমাদের সাথে এসব শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যখনই আমি মু'মিনদের দল নিয়ে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করেছি তখন তারা আমাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র খালি করে দিয়েছে; অর্থাৎ আমরা বিজয়ী হয়েছি আর তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ আমাদের জয়যুক্ত করেছেন। কিন্তু আজ কী হলো যে, তাদের ওপর আক্রমণ করা সত্ত্বেও তাদেরকে তোমরা পিছু হটাতে পার নি? অতএব এর কারণ সম্পর্কে তার যে আশংকা ছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তোমাদের সম্পর্কে আমি দুটি বিষয়ের আশংকা করছি; হয় তোমাদের মাঝে কোন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে অথবা আক্রমণের সময় তোমরা নিষ্ঠাবান ছিলে না। হয় তোমরা বিশ্বাসঘাতক, নতুবা তোমাদের নিষ্ঠা নেই কিংবা তাদের ওপর তোমরা যখন আক্রমণ করেছিলে তখন (তোমাদের মাঝে) নিষ্ঠা ছিল না। এরপর তিনি তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে শাহাদাত কামনার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের সর্বাগ্রে থাকব এবং কখনোই পিছু হটব না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা বিজয় অথবা শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। অতএব মুসলমান এবং রোমানদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হলে উবাদা বিন সামেত তাঁর ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পদাতিক (যোদ্ধা) হয়ে যান। তাকে পদাতিক অবস্থায় দেখে উমায়ের বিন সা'দ আনসারী সেনাপতির পদাতিক যুদ্ধের সংবাদ মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে বলেন, সবাই যেন তার রীতি অনুসরণ করে। অতএব রোমানদের বিরুদ্ধে সবাই তুমুল যুদ্ধ করে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। অবশেষে তারা পালিয়ে গিয়ে শহরের দুর্গে আশ্রয় নেয়।

আরবরা যেভাবে কায়সারিয়া জয় করেছিল সেভাবে গাজাও জয় করে নেয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালেও একবার মুসলমানরা গাজার দখল নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়। এই দু'টি সীমান্তবর্তী অঞ্চল যখন মুসলমানদের করতলগত হয় তখন হযরত আমর বিন আস (রা.) সমুদ্রের দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

এসব ঘটনার উল্লেখ অব্যাহত থাকবে। এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণকরতে চাই আর জুমুআর নামাযের পর তাদের জানাযাও পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ হলো কেরালার সাবেক মোবাল্লেগ জনাব কে মুহাম্মদ আলভী সাহেবের সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া খাদিজা সাহেবার, যিনি কিছুদিন পূর্বে তিনি ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা কেহ্‌নী মহিউদ্দিন সাহেব কেরালার প্রাথমিক আহমদীদের একজন ছিলেন। মরহুমাও খুবই অল্প বয়সে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। অত্যন্ত ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, নিয়মিত নামায ও রোযা পালনকারী, ধার্মিক, দরিদ্র হিতৈষী, অতিথিপরায়ণ এবং স্বল্পে-তুষ্ট মহিলা ছিলেন। মরহুমার স্বামী জামা'তের মোবাল্লেগ ছিলেন, জামা'তী সফরের কারণে তিনি দিনের পর দিন বাইরে থাকতেন; কিন্তু মরহুমা সর্বদা কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং কোন ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ করেন নি। তিনি তার অবর্তমানে দুই ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে রয়েছে। মরহুমা ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার বড় ছেলে কে মাহমুদ সাহেবও জামা'তের মোবাল্লেগ ছিলেন যিনি ৫৪ বছর বয়সে কিডনী অকেজো হওয়ার ফলে মৃত্যুবরণ করেন। তার ছোট ছেলেও জামা'তের মোয়াল্লেম এবং পাঁচ মেয়েরই বিয়ে হয়েছে মুরব্বীদের সাথে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো কোট ফতেহ্ খানের মালেক সুলতান রশীদ খান

সাহেবের, যিনি আটক জেলার প্রাক্তন জেলা আমীর ছিলেন। মালেক সুলতান রশীদ খান সাহেব ২২ ও ২৩ আগস্টের মধ্যবতী রাতে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃ পায় তিনি মুসী (ওসীয়্যতকারী) ছিলেন। তার পিতা কর্ণেল মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব ১৯২৩ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। তিনি পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলেন। এরপর তার বিয়ে হয় আয়েশা সিদ্দীকা সাহেবার সাথে, যিনি চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল সাহেবের কন্যা ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ই এই বিয়ে করিয়েছিলেন। মালেক সুলতান রশীদ সাহেবের দাদার নাম ছিল মালেক সুলতান সুর্খরু খান, তিনি বৃটিশ সরকারের দরবারে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন; দরবারে তাকে (বসার জন্য) আসন দেয়া হতো। তিনি নিজ পুত্র মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেবের চার বছর পর আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

মালেক সুলতান রশীদ খান সাহেবের জামা'তী কার্যক্রমের বিবরণ হলো ৯৬ থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত এবং এরপর ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আটক জেলার জেলা আমীর হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মৃত্যুকালেও তিনি কোট ফতেহ্ খান জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর মীর মুহাম্মদ খান সাহেবের তিনি আত্মীয় ছিলেন; কিন্তু সেটি পার্থি বতায় নিমগ্ন পরিবার ছিল। অথচ তার পিতা আহমদী হওয়ার পর সম্পূর্ণরূপে পার্থিবতা ত্যাগ না করলেও ধর্মকে প্রাধান্য দানকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর এই একই বৈশিষ্ট্য ছিল মালেক সুলতান রশীদ খান সাহেবের মাঝেও। তিনি প্রথমদিকে এক দশমাংশের ওসীয়্যত করেন, পরবর্তীতে এক সপ্তমাংশ ওসীয়্যত করেন, এরপর হিস্যায়ে জায়েদাদ (সম্পত্তির ওসীয়্যতকৃত অংশ)ও পরিশোধ করে দেন। আমার ধারণা, সম্ভবত সম্পত্তির এক দশমাংশের ওসীয়্যত ছিল আর আয়ের ওপর এক সপ্তমাংশের ওসীয়্যত ছিল। তার বোন রাশেদা সাইয়াল সাহেবা বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একবার আমাকে লিখেছিলেন, তোমার পিতা আহমদীয়াতের জন্য এক নগ্ন তরবারি ছিলেন আর তোমার ভাইদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এরপর তিনি মালেক রশীদ সাহেব সম্পর্কে বলেন, খিলাফতের সাথে আমার ভাইয়ের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল, খলীফাতুল মসীহ্র প্রতিটি নির্দেশ তৎক্ষণাৎ পালন করতেন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপায় তিনি খিলাফতের আস্থাভাজন সেবক ছিলেন এবং পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে জামা'তী দায়িত্ব পালন করেছেন। আধ্যাত্মিকতাও তার মাঝে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। কেউ তাকে দেখলে অনুভব করতো যে, এই পার্থিব জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজের সম্পর্কে র বিষয়ে বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। দিনরাত সব সময় প্রত্যেকের জন্য দোয়ায় নিমগ্ন থাকতেন, তারা বন্ধু হোক বা আত্মীয় হোক কিংবা অপরিচিত কেউ। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন বা অনাত্মীয়দের মধ্য থেকে এমন একজনও নেই যে কখনো তার দুয়ার থেকে খালি হাতে ফিরে গিয়েছে। বেশ কয়েক ব্যাক্তি তার বদান্যতার অন্যায় সুযোগও নিয়েছে। কাউকেই তিনি 'না' বলতে পারতেন না।

তিনি বলেন, আমার ভাতিজির কাছে এক মহিলা এসে বলে, সেই অভাবী পরিবারগুলোর কী হবে, যেখানে কেবল সুলতান রশীদ সাহেবের পয়সায় উনুনে হাঁড়ি চড়ত? অর্থাৎ সুলতান রশীদ সাহেবের সাহায্যে তাদের দিনাতিপাত হতো। তিনি কতটা বদান্যতা প্রদর্শন করতেন তার প্রকৃত ধারণা আমাদের নেই। আমার ভাতিজি একদিন তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি যে মানুষের এত উপকার করেন, মানুষ কি এগুলোর মূল্যায়ন করবে বা মনে রাখবে? তখন তিনি বলেন, হয়তো আমাকে মনে রাখবে না, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন। তার আরেক বোন নাঈমা সাহেবা বলেন, আমার ভাইয়ের মাঝে তবলীগ করার খুব গভীর উদ্দীপনা ছিল, তিনি বেশ কয়েকজন পুণ্যাত্মার হেদায়েত লাভের কারণ হয়েছেন।প্রত্যেক সাক্ষাৎকারীর সাথে তবলীগের সুযোগ বের করে নিতেন। অ-আহমদী বন্ধুরা প্রায়শ সন্ধ্যায় চলে আসতো আর ঘন্টার পর ঘন্টা ওফাতে মসীহ্-র বিষয়ে বিতর্ক হতো, অথচ এতে বিপদের আশঙ্কাও ছিল। ইবাদতে তার আনন্দ ও আগ্রহেরও চিত্র ছিল অভাবনীয়। সাধারণত ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে একাকী- সঙ্গোপনে নিজ প্রভুর সাথে কথা বলতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সত্যস্বপ্ন এবং দিব্যদর্শন দ্বারাও সম্মানিত করেছেন। একবার অ্যাবোটাবাদে গ্রীষ্মের ছুটিতে যান। হঠাৎ সেখানে একটি আর্থি ক সমস্যায় নিপতিত হন। দোয়া ছাড়া কিছুই করার সামর্থ ছিল না। তিনি বলেন, সকালে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বৃক্ষবহুল একটি জায়গার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি উঁচু ও স্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসে যে, লা তাকনাতু মির্‌রাহমাতিল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্ল াহ্‌র দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না।)

আটক জেলার প্রাক্তন আমীর যুবায়রী সাহেবের স্ত্রী তার বোনকে বলেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে জেলার মিটিংয়ের জন্য (মরহুম) যখন তার বাসায় অবস্থানরত ছিলেন, তখন তার চেহারায় কিছুটা উৎকণ্ঠা ছিল। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, একটি বক্তৃতা করতে হবে, কিন্তু প্রস্তুতি মোটেই নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরের দিন সকালে বেশ উৎফুল্ল ছিলেন। নাশতার জন্য এসে বলেন, রাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) স্বপ্নে আসেন আর পুরো বক্তৃতা কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি লিখিয়ে দিয়েছেন;আলহামদুলিল্লাহ্, আমার বক্তৃতা তৈরি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি এতটা অগাধ ভরসা ছিল যে গ্রামে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় একাকী পরম প্র শান্তি র সাথে বছরের পর বছর জীবন অতিবাহিত করেছেন, কোন ভয় বা উৎকণ্ঠা ছিল না। অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি বলতেন, খোদার নির্দেশ ছাড়া গাছের পাতাও নড়তে পারে না। একবার তার এক কর্মচারী কোন সাহায্যপ্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে তাকে বুঝান যে, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাকে কারো জন্য উসিলা (মাধ্যম) বানাতে চান তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার আমি কে? সকল প্রকার জ্ঞানগর্ভ আলোচনার দক্ষতা রাখতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী কয়েকবার অধ্যয়ন করেছিলেন। মাশাআল্লাহ্, যাবতীয় উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের আধারছিলেন। নামায-রোযা পালনকারী, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, দোয়াকারী আর একান্ত প্র জ্ঞাসূচক ভঙ্গিমায় কথা বলার দক্ষতা রাখতেন। সকল আলাপ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তবলীগে নিয়ে শেষ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো ইন্দোনেশিয়ার মোকাররম আব্দুল কাইয়্যুম সাহেবের। গত ২৫ আগস্ট তারিখে ৮২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। তিনি মরহুম মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সুমাত্রী সাহেবের পুত্র ছিলেন, যিনি পাক-ভারতের বাইরের (কোন জাতি হতে) প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রসিদ্ধ টেকনিক্যাল স্কুল থেকে তিনি কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য ফ্রান্স গমন করেন এবং পেট্রোলিয়াম ইকোনোমিকস বিষয়ে সেখানে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে চাকরি নেন। সেখানে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসরগ্রহণ সত্ত্বেও নিজ কর্মক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাকে কাজে লাগানো হতো। এরপর ৭৩ বছর বয়সে অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে তিনি ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দেশের জন্যও অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পাদন করেছেন। ৭৩ সনে তিনি সরকারের কাছে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পর্কে একটি ফর্মূলা প্রস্তাব করেন আর তখন থেকে নিয়ে অর্থাৎ ১৯৭৪ সন থেকে নিয়ে ২০০০ সন পর্যন্ত এর কারণে সরকারের ১১০ বিলিয়ন ডলার লাভ হয়েছে। যাহোক, একজন আহমদী সকল স্থানে দেশ ও জাতির সেবা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়াতেও মোল্লাদের প্রভাবে কিছু কিছু এলাকায় আহমদীয়াতের বিরোধিতা অনেক বেড়ে যায়, তা সত্ত্বেও আমাদের কাজ হলো দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। তিনি আমলা হিসেবে দেশীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেছেন। ২০০৫ সনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক লাভ করেছেন, যা ইন্দোনেশিয়ান সরকার বেসামরিক লোকদেরকে অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য সেবাকর্মের জন্য প্রদান করে থাকে। আর জাতির মহান সেবকদেরকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কবরস্থানে সামরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সমাধিস্থ করা হয়। যাইহোক, মরহুম যেহেতু সেখানে সমাহিত হবেন না, তাই তার মৃত্যুপরবতী সামরিক অনুষ্ঠানটি পারুং-এ মূসীয়ানদের কবরস্থানে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে তাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

অত্যন্ত অমায়িক ছিলেন, নিজের ভাইবোনদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। তার পিতার উপদেশ ছিল, তিনি যেন তার ভাইবোনদের দেখাশুনা করেন, আর সর্বদা তিনি তা পালন করেছেন। মুরব্বী ও ওয়াকফে যিন্দেগীদের সাথে অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ও সম্মানপূর্ণ ব্যবহার করতেন। তার ছোট ভাই বাসেত সাহেব জামাতের মুবাল্লিগ এবং ইন্দোনেশিয়া জামা'তের আমীর। অধীনস্তদের সাথেও তার ব্যবহার খুবই ভালো ছিল। তার এক অধীনস্ত বলেন, নয় বছর বয়স থেকে মরহুম আমার ভরণপোষণ করেছেন। স্কুলের ফিস ইত্যাদি মরহুমই মেটাতেন। তার উত্তম ব্যবহারের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্ত ক পাঠের পর আমিও বয়আত করে নিই। মরহুমের দয়া ও উদারতা ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। মানুষের সাথে সর্বদা সমান ব্যবহার করতেন। কখনো নিজকে নিয়ে অহংকার করেন নি আর নিজের পদের জন্যও অহংকার করেন নি। সরকারী গ্যাস কোম্পানিতে তার প্রাক্তন এক সহকমী বলেন, তিনি খুবই মেধাবী, অবিচল ও পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি খুবই সুখ্যাত ও বড় কর্মকর্তা ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও খুবই বিনয়ী ছিলেন। খিলাফত ও জামা'তের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। যখনই জামা'তের কুরবানীর প্রয়োজন হতো, কিংবা বিপদের মোকাবিলা করতে হতো, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সাহায্য করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যখন ইন্দোনেশিয়া যান তখন তিনি তার ঘরেই অবস্থান করেছিলেন। সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করতে গিয়ে মরহুম কখনো নিজের আহমদী হওয়ার বিষয়টি গোপন করেন নি, কিংবা পরবতীতেও নয়; অথচ বিরোধিতা পরবতীতে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু নিজের আহমদী পরিচয় তিনি কখনো গোপন করেন নি। নিজ বন্ধুদের তবলীগ করার বিষয়ে তৎপর ছিলেন আর একজন সুপরিচিত আহমদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুখ্যাত ছিলেন। একবার এক বিদ্যুৎ কোম্পানীর সি.ই.ও. মন্ত্রীকে বলেন, বাঁধের পানি হ্রাস পাচ্ছে, আর কিছুদিন এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। মন্ত্রী সাহেবের

(শেষাংশ শেষের পাতায়....)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে সর্বাপেক্ষা এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে মহান বিজয় দান করেছিলেন।

ইয়ারমুকের মহাযুদ্ধের ঈমান উদ্দীপক বিশদ আলোচনা।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১৭ তবুক, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উমর (রা.)-এর যুগের ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল। আজ ইয়ারমুকের যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করব। ইয়ারমুকের যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে রেওয়ায়েত সমূহে মতভিন্নতা রয়েছে। একটি রেওয়ায়েত হলো, এই যুদ্ধ ১৫ হিজরী সনে হয়েছিল। কারো কারো মতে ১৩ হিজরীতে দামেস্ক বিজয়ের পূর্বে এই লড়াই হয়েছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উমর সর্বপ্রথম যে যুদ্ধের বিজয় সম্পর্কে সুসংবাদ লাভ করেন তা ছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধ তখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর ২০দিন অতিবাহিত হয়েছিল। কারো কারো মতে দামেস্ক বিজয়ের সুসংবাদ সবার আগে লাভ হয়েছিল।

(তারিখে দামাস্ক আল কাবীর লি ইবনে আসাকির, ২য় ভাগ, পৃ: ১৪১-১৪৩)

যাহোক, দামেস্ক বিজয় প্রথমে হওয়ার কথাটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এটিই প্রতিভাত হয় যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধ হযরত উমর (রা.)-এর যুগেই হয়েছিল। রোমানরা বারংবারের পরাজয়ের ফলে দামেস্ক এবং হিমস ইত্যাদি স্থান থেকে বের হয়ে আনতাকিয়া পৌঁছে। আনতাকিয়া সিরিয়ার সীমান্তবর্তী একটি শহর। (তারা) হিরাক্লিয়াসের কাছে নিবেদন করে যে, আরবরা পুরো সিরিয়াকে পদদলিত করেছে। হিরাক্লিয়াস তাদের মধ্য থেকে কতক বিচক্ষণ এবং সম্মানীত ব্যক্তিকে নিজ দরবারে তলব করে এবং বলে, আরবরা শক্তি, সংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে তোমাদের তুলনায় দুর্বল, তাহলে তোমরা কেন তাদের মোকাবিলা করতে পারছ না, কেন তাদের মোকাবিলায় তোমরা অবিচল থাকতে পার না। এতে তারা সবাই লজ্জায় মাথা নীচু করে নেয়, কেউ কোন উত্তর প্রদান করে নি। কিন্তু এক অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তি বলে যে, আরবদের চরিত্র আমাদের চরিত্রের চেয়ে উত্তম। তারা রাতে ইবাদত করে, দিনের বেলায় রোযা রাখে। কারো প্রতি অন্যায় করে না। পরস্পরের সাথে সাম্যের সাথে মেলামেশা করে। আর আমাদের অবস্থা হলো, (আমাদের লোকেরা) মদ পান করে, অপকর্মে লিপ্ত থাকে, প্রতিশ্রুতি পালন করে না, অন্যদের প্রতি অন্যায় করে। এরই এটি ফলাফল যে, তাদের কাজে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা আছে আর অবিচলতা বিদ্যমান, আর আমাদের কাজ মনোবল ও অবিচলতাশূন্য হয়ে থাকে।

সিজার আসলে সিরিয়া ছেড়ে যাওয়ার সংকল্প করে নিয়েছিল। কিন্তু সকল শহর এবং জেলা থেকে দলে দলে অনবরত খ্রিষ্টান সাহয্যপ্রার্থীরা আসছিল। সিজারের প্রচণ্ড আত্মাভিমান জেগে উঠে আর প্রবল উচ্ছ্বাসের সাথে সে নিজের রাজত্বের পুরো শক্তি আরবদের মোকাবিলায় ব্যয় করতে উদ্যত হয়। রোম, কনস্টানটিনোপোল, এন্তিনিয়া, আর্মেনিয়া দ্বীপসহ সকল স্থানে সে বার্তা প্রেরণ করে যে, সকল সেনাদল যেন আনতাকিয়ায় একটি নির্দিষ্ট তারিখ এর পূর্বে উপস্থিত হয়। সকল জেলার কর্মাকর্তাদের সে লিখে পাঠায় যে, যেখান থেকে যত বেশি লোক পাঠানো সম্ভব প্রেরণ করা হোক। সেসব বার্তা পৌঁছতেই সেনাদলের এক তুফান ধেয়ে আসে। আনতাকিয়ার চতুর্দিকে যত দূর চোখ যেতো সেনাদল পঙ্গপালের ন্যায় বিস্তৃত ছিল। অসংখ্য সেনাদল ছিল সেখানে।

হযরত আবু উবায়দা যেসব স্থান জয় করেছিলেন সেসব স্থানের ধনাঢ্য ও নেতাদের মাঝে তার ন্যায় ও সুবিচারের কারণে মুসলিম প্রীতি এতটা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ধর্মীয় বিরোধ সত্ত্বেও স্বয়ং নিজেদের পক্ষ থেকেই তারা শত্রুদের খবর সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করে রেখেছিল। অতএব তাদের মাধ্যমে হযরত আবু উবায়দা সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন। তিনি সব সেনাধ্যক্ষকে একত্রিত করেন এবং দাঁড়িয়ে একটি প্রভাব বিস্তারী বক্তৃতা করেন, যার সারাংশ ছিল: হে মুসলমানেরা! খোদা তা'লা তোমাদের বারবার পরীক্ষা করেছেন, আর তোমরা তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। একারণে খোদা তা'লা সর্বদা তোমাদের সাফল্যমণ্ডিত ও সাহায্যপুষ্ট রেখেছেন। তোমরা সর্বদা সাফল্য অর্জন করেছ। এখন তোমাদের শত্রুরা এমন প্রস্তুতি নিয়ে তোমাদের মোকাবিলায় বেরিয়েছে যে, ভূমি কেঁপে উঠেছে। এখন বল, তোমাদের পরামর্শ কী? আমীর মুআবিয়ার ভাই ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, আমার অভিমত হলো, নারী ও শিশুদের শহরের ভেতর থাকতে দিন, আর আমরা নিজেরা শহরের বাইরে সেনাসারি বিন্যস্ত করি। সেই সাথে খালেদ ও আমর বিন আস-কে পত্র প্রেরণ করা হোক যেন তারা দামেস্ক ও ফিলিস্তিন থেকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। এই ঘটনা থেকেও এটিই প্রমাণ হয় যে, দামেস্ক জয় এর পূর্বে হয়েছিল। শারাহবিল বিন হাসানা বলেন, এই বিষয়ে প্রত্যেকের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা উচিত। ইয়াযিদ যে অভিমত দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে হিতাকাঙ্ক্ষা থেকেই দিয়েছেন, কিন্তু আমি এর সাথে দ্বিমত পোষণ করি। শহরের বাসিন্দারা সবাই খ্রিষ্টান; হতে পারে যে, তারা বিদ্বেষবশত আমাদের পরিবার-পরিজনদের ধরে নিয়ে সিজারের হাতে তুলে দেবে, কিংবা নিজেরাই তাদের হত্যা করবে, নিজেরাই তাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে যাবে। হযরত আবু উবায়দা বলেন, এর সমাধান হলো, আমরা খ্রিষ্টানদের শহর থেকে বের করে দিই, তাহলেই আমাদের স্ত্রী-সন্তানরা নিরাপদ হয়ে যাবে। শারাহবিল দাঁড়িয়ে বলেন, হে আমীর! কোনক্রমেই আপনার এই অধিকার নেই! আমরা এই খ্রিষ্টানদের এ শর্তে নিরাপত্তা দিয়েছি যে, তারা শহরে নিশ্চিন্তে বসবাস করবে; তাই আমরা কীভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারি? আমরা তাদের সাথে একটা অঙ্গীকার করেছি, তাই তাদেরকে শহর থেকে বের করে দিয়ে কীভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারি ? হযরত আবু উবায়দা নিজের ভুল স্বীকার করেন, কিন্তু উক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি যে, তাহলে কী করা যায়? সাধারণ জনগণ এই মতামত ব্যক্ত করে যে, হিমসে অবস্থান করে সামরিক সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা হোক। আবু উবায়দা বলেন, এত সময় কোথায়? অবশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, হিমস ছেড়ে দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করা হোক; সেখানে খালেদ উপস্থিত রয়েছেন এবং আরবের সীমান্তও সেখান থেকে কাছে। এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে হযরত আবু উবায়দা কোষাধ্যক্ষ হাবীব বিন মাসলামাকে ডেকে বলেন, খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে যে জিযিয়া বা খিরাজ নেওয়া হয়, অর্থাৎ কর হিসেবে যা-ই আদায় করা হয় (তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও।) এই মুহূর্তে আমাদের অবস্থা এতটা শোচনীয় যে, আমরা তাদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করতে অপারগ; তা তাদের নিরাপত্তার জন্যই নেওয়া হতো, তাদের কল্যাণের জন্য নেওয়া হতে, কিন্তু তা তো আমরা করতে পারছি না। এজন্য যা-ই তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে, সব তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক এবং তাদেরকে বলে দাও- তোমাদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক ছিল তা এখনও আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু আমরা তোমাদের নিরাপত্তা বিধান করতে অপারগ, তাই নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্তে গৃহীত জিযিয়া তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ফলে কয়েক লক্ষ পরিমাণ মুদ্রা, যা আদায় করা হয়েছিল, সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। খ্রিষ্টানদের ওপর এই ঘটনার এতটা প্রভাব পড়ে যে তারা কাঁদতে থাকে এবং আবেগাপ্লুত হয়ে বলতে থাকে, খোদা তোমাদের ফিরিয়ে আনুন। ইহুদিদের ওপর এর চেয়েও গভীর প্রভাব পড়েছিল। তারা বলে, তওরাতের শপথ! যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি, সিজার হিমস দখল করতে পারবে না। একথা বলে তারা শহরের নিরাপত্তা-ফটক বন্ধ করে দেয় এবং সর্বত্র প্রহরা-চৌকি বসায়। আবু উবায়দা কেবল হিমসবাসীদের সাথেই এরূপ ব্যবহার করেন নি, বরং যতগুলো অঞ্চল বিজিত হয়েছিল সকল স্থানেই লিখে পাঠান যে, জিযিয়া হিসেবে আদায়কৃত পুরো অর্থ যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর আবু উবায়দা দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন এবং এই সকল বৃত্তান্ত সম্পর্কে হযরত উমরকে অবগত করেন।

মুসলমানরা রোমানদের ভয়ে হিমস ছেড়ে চলে এসেছে- একথা শুনে হযরত উমর খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারেন যে, সমগ্র বাহিনী ও সেনাধ্যক্ষরা ঐকমত্যের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তখন তিনি পুরোপুরি আশ্বস্ত হন এবং বলেন, হয়ত খোদা তা'লা কোন প্রজ্ঞার অধীনে সকল মুসলমানকে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে একমত করেছেন। এরূপ বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, প্রথমে হযরত উমরের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং হযরত উমর-ই বলেছিলেন যে, যদি তোমরা তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে না পার, তবে তোমরা

জিযিয়া ইত্যাদি যা-ই তাদের কাছ থেকে নিয়েছ, সবকিছু ফিরিয়ে দাও। হযরত উমর আবু উবায়দাকে প্রত্যুত্তরে লিখেন, আমি সাহায্য করার জন্য সাঈদ বিন আমরকে পাঠাচ্ছি, কিন্তু জয়পরাজয় সৈন্যদের সংখ্যাস্বল্পতা বা সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে না। দামেস্ক পৌঁছে আবু উবায়দা সকল সেনাকর্মকর্তাকে একত্রিত করেন এবং তাদের সাথে শলা-পরামর্শ করেন। ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান, শারাহবিল বিন হাসানা, মু'আয বিন জাবাল- সবাই ভিন্ন ভিন্ন মতামত দেন। ইতোমধ্যেই আমর বিন আস-এর দূত পত্র নিয়ে পৌঁছে, যার বিষয়বস্তু এরূপ ছিল - জর্ডানের অঞ্চলগুলোতে গণবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে এবং রোমানদের আগমনবার্তা চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে আর হিমস ছেড়ে চলে আসাটা নিতান্তই প্রভাব খর্ব হওয়ার কারণ হয়েছে। আবু উবায়দা উত্তরে লিখেন, আমরা ভয়ের কারণে হিমস ছেড়ে আসি নি, বরং উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুরা যেন সুরক্ষিত স্থানগুলো থেকে বের হয়ে আসে এবং ইসলামী সৈন্যরা যারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারা যেন একস্থানে সমবেত হয়। এছাড়া পত্রে তিনি এও লিখেন যে, তোমরা নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করো না, আমি সেখানে এসেই তোমাদের সাথে একত্রিত হব। দ্বিতীয় দিন আবু উবায়দা দামেস্ক থেকে রওয়ানা হলেন এবং জর্ডানের সীমান্তে ইয়ারমুকে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। ইয়ারমুক সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী নীচু উপত্যকা ছিল, যেখানে জর্ডান নদী প্রবাহিত হতো। আমর বিন আসও এখানে এসেই মিলিত হয়েছেন। এই সুযোগ যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে একারণে যথার্থ ছিল যে, আরবের সীমান্ত অন্যান্য সকল স্থানের চেয়ে এখান থেকে নিকটে ছিল। পেছনেই আরবের সীমান্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত ময়দান ছিল যার ফলে এই সুযোগ ছিল যে, প্রয়োজনে যতদূর ইচ্ছা পেছনে সরে আসার সুযোগ ছিল।

হযরত উমর, সাঈদ বিন আমরের সাথে যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, তা তখনও এসে পৌঁছে নি। এদিকে রোমানদের আগমনবার্তা এবং তাদের সাজসরঞ্জামের বিবরণ শুনে মুসলমানরা বিচলিত ছিল। আবু উবায়দা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আরেকজন দূতকে প্রেরণ করেন এবং লিখেন, রোমানরা জল-স্থল সকল দিক থেকে উপচে পড়েছে আর তাদের উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার অবস্থা এমন যে, যেপথেই সেনাবাহিনী যায়, যারা কখনো ঘর থেকে বের হয়নি এমন সাধু-সন্যাসীরাও বের হয়ে এসে সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিচ্ছে। এই পত্র পৌঁছলে হযরত উমর মুহাজের ও আনসারদের একত্রিত করেন এবং পত্র পড়ে শুনান। সাহাবীরা চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন নি এবং অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে উচ্চস্বরে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! খোদার খাতিরে আমাদেরকে আমাদের ভাইদের জন্য জীবন বাজি রাখার অনুমতি দিন। খোদা না করুন, তাদের যদি সামান্যতম ক্ষতিও হয় তাহলে আমাদের জীবিত থাকা অর্থহীন। মুহাজের ও আনসারদের আবেগ-উচ্ছ্বস ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এমনকি আব্দুর রহমান বিন অউফ বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি নিজে সেনাপতি হোন এবং আমাদেরকে সাথে নিয়ে চলুন। কিন্তু অন্য সাহাবীরা এই মতের বিরোধিতা করেন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আরও সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করা হোক। হযরত উমর দূতকে জিজ্ঞেস করেন যে, শত্রুরা কতদূর এসেছে? সে বলে, ইয়ারমুক থেকে তিন চার মনযিল দূরত্বে আছে। হযরত উমর অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হন এবং বলেন, আফসোস! এখন কী হতে পারে? এত কম সময়ে কীভাবে সাহায্য পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে? তিনি তখন হযরত আবু উবায়দার নামে নিতান্ত প্রভাব বিস্তারী শব্দাবলীতে একটি পত্র লিখেন এবং দূতকে বলেন, নিজে প্রতিটি সারির কাছে গিয়ে এই পত্র পড়ে শুনাবে এবং নিজ মুখে বলবে যে, উমর তোমাদেরকে সালাম বলেছেন এবং আরো বলেছেন, হে মুসলমানরা! প্রাণান্তকর লড়াই কর এবং নিজ শত্রুদের উপর বাঘের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড় আর তরবারি দ্বারা তাদের মাথা কেটে ফেল এবং তারা যেন তোমাদের কাছে পিপীলিকার চেয়েও তুচ্ছ হয়ে যায়। তাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে যেন ভীত-ত্রস্ত না করে এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি তাদের জন্য চিন্তিত হবে না। এটি এক অদ্ভুত দৈব ঘটনা যে, যেদিন দূত আবু উবায়দার কাছে আসে সেদিনই সাঈদ বিন আমেরও সহস্র সেনাসহ পাঁছে যান। এতে মুসলমানদের অসাধারণ শক্তি লাভ হয় এবং তারা অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ততার সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ আরম্ভ করে।

তিনি মুআয বিন জাবালকে, যিনি অনেক বড় মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন, সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বে নিযুক্ত করেন। কুবাস বিন আশইয়ামকে বাম পার্শ্বে এবং হাশেম বিন উতবাকে পদাতিক বাহিনীর অফিসার নিযুক্ত করেন। নিজ অশ্বারোহী বাহিনীকে তিনি চার ভাগে ভাগ করেন। একটি অংশকে নিজ কর্তৃত্বে রাখেন, বাকিগুলোর জন্য কায়েস বিন হুবায়রা, মায়সারা বিন মাসরুক এবং আমর বিন তোফায়েলকে নিযুক্ত করেন। উক্ত তিন জনই পুরো আরবে বীর হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, অর্থাৎ অনেক সাহসী হিসেবে পরিচিত ছিলেন আর এ কারণে তাদেরকে 'ফারিসুল আরব' বলা হতো। রোমানরাও পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে বের হয়েছিল। দুই লাখের অধিক সেনাসদস্য ছিল এবং চব্বিশটি সারি ছিল যাদের সামনে তাদের ধর্মীয় নেতারা হাতে ক্রুশ নিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছিল।

উভয় সেনাদল মুখোমুখি হলে এক 'বেতারিক' সারি ভেদ করে সামনে অগ্রসর হয়ে বলে, (খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় নেতাকে বেতারিক বলা হয়) আমি একা লড়তে চাই। মায়সারা বিন মাসরুক ঘোড়া নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে গেলে প্রতিপক্ষ যেহেতু খুব শক্তিশালী যুবক ছিল, তাই খালেদ তাকে বাধা দেন এবং কায়েস বিন হুবায়রার দিকে তাকান। তিনি রণসঙ্গীত গেয়ে সামনে অগ্রসর হন। কায়েস প্রতিপক্ষের উপর এমন ক্ষীপ্র গতিত ঝাপিয়ে পড়েন যে বেতরীক অস্ত্র হাতে নেওয়ারও সময় পায় নি; তার আঘাত মোক্ষম প্রমাণিত হয়। তরবারি মাথায় লাগে আর হেলমেট কেটে ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বেতরিক দোদুল্যমান হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। এর সাথেই মুসলমানরা 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি উচ্চকিত করল। খালেদ বলে উঠলেন, লক্ষ্মণ শুভ! এখন আল্লাহ্ চাইলে বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবে। খ্রিস্টানরা খালেদের সহযোদ্ধা অফিসারদের মোকাবিলায় পৃথক পৃথক সেনাদল মোতায়েন করে, কিন্তু সবগুলো পরাস্ত হয় আর দিনের শেষে যুদ্ধ মুলতবি হয়। রোমানরা যখন দেখল তারা পরাজিত হচ্ছে তখন রাতের বেলা রোমান সেনাপতি 'বাহান' সেনাপ্রধানদের একত্রিত করে বলে, আরবরা সিরিয়ার সম্পদের মোহে পড়ে গেছে। যুদ্ধ করার পরিবর্তে তাদেরকে সম্পদ ও স্বর্ণের লালসা দিয়ে এখান থেকে অপসরণ করাই উত্তম হবে। সবাই এই সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করে। পরের দিন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে দূত প্রেরণ করে বার্তা পাঠায় যে, তোমাদের কোনো সম্মানিত অফিসারকে আমাদের কাছে প্রেরণ কর, আমরা তার সাথে সন্ধি-চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালেদ'কে মনোনীত করলেন। বার্তাসহ আগমনকারী রোমীয় বার্তাবাহক দূতের নাম ছিল জর্জ। আরবী ভাষাভাষীদের জন্য বলছি, উর্দূ সীরাত প্রণেতাগণ তার নাম জর্জ বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু আরবী পুস্তকাদীতে তার নাম 'জারজাহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা সেই বার্তাবাহক-দূত যখন এসে উপস্থিত হয় তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছিল এবং কিছুটা বিলম্বে মাগরিবের নামায শুরু হয়। মুসলমানরা যে উৎসাহ -উদ্দীপনার সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়াল এবং যে একাগ্রতা, প্রশান্তি, ভাবগাম্ভীর্য এবং কাকুতি-মিনতির সাথে নামায আদায় করল, তা বার্তাবাহক -দূত অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে। নামায শেষ হতেই সে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করল যার মাঝে একটি প্রশ্ন হল, 'তোমরা ঈসা (আ.)-এর বিষয়ে কী বিশ্বাস রাখ? হযরত আবু উবায়দা (রা.) পবিত্র কুরআনের যে আয়াতসমূহ পড়ে শুনালেন তা নিম্নরূপ:

إِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (সূরা আলে-ইমরান: ৬০) অনুবাদ: নিশ্চয় ঈসার অবস্থা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আদমের ন্যায়। তাকে (অর্থাৎ আদমকে) তিনি শুষ্ক মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এরপর তার সম্পর্কে বললেন অস্তিত্ব পরিগ্রহ কর, তখন সে অস্তিত্ব লাভ করল।

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ
وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَاۤ
اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ
اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○
لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ (النساء:172-173)

অনুবাদ: হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্‌র বিষয়ে সত্য বৈ অন্য কথা বলো না। নিশ্চয় মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র এক রসূল মাত্র এবং তাঁর কালাম (-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী) ছিল যা তিনি মরিয়মের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ (তথা রহমত) ছিল; অতএব তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আনো আর বলো না- (আল্লাহ) তিন। তোমরা (এমন বলা থেকে) বিরত হও, তোমাদের জন্য এটিই উত্তম, নিশ্চয় আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয় প্রভু। তিনি পুত্র গ্রহণ করার মত বিষয় থেকে পবিত্র, যা কিছু আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে আছে সবই তাঁর এবং কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহ্ যথেষ্ট আর আল্লাহ্‌র সুরক্ষা লাভের পর অন্য কারও সুরক্ষার প্রয়োজন নেই।মসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়া কখনো অপছন্দ করবে না এমনকি আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণও নয়।

(সূরা আননিসা: ১৭২-১৭৩)

মোটকথা অনুবাদক যখন আয়াতগুলোর অনুবাদ করে শোনাল তখন জর্জ নামক সেই বার্তাবাহক-দূত অবলীলায় বলে উঠল, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, 'ঈসার সঠিক বৈশিষ্ট্য এগুলোই আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমাদের নবী সত্য।

একথা বলে তিনি কলেমায়ে তওহীদ পাঠ করেন ও মুসলমান হন এবং তাঁর জাতির কাছে ফিরে যেতে সম্মত ছিল না কিন্তু রোমীয়রা কোথাও অঙ্গীকার ভঙ্গের সন্দেহ না করে এ আশংকায় হযরত আবু উবাদা (রা.) তাঁকে বাধ্য করেন এবং তিনি (রা.) বলেন, আগামীকাল এখান থেকে আমাদের পক্ষ থেকে যে দূত যাবে তার সঙ্গে চলে এসো, এখন ফিরে যাও। পরদিন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) রোমীয়দের সেনানিবাসে যান। রোমীয়রা তাদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেখেছিল; পথের দু'ধারে অনেক দূর পর্যন্ত সারি সারি অশ্বারোহী আপাদমস্তক লৌহবর্মে আবৃত ছিল কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তাদের দিকে উপেক্ষা করেন এবং নেহায়েৎ

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকান আর এমনভাবে তিনি (রা.) তাদের দিকে তাকান, যেভাবে সিংহ ছাগলের পালকে লণ্ডভণ্ড করে এগিয়ে যায়। তিনি (রা.) বাহানের তাঁবুতে পৌঁছালে সে খুব সম্মানের সাথে তাঁকে (রা.) স্বাগত জানায় এবং এনে তাঁকে (রা.) তার পাশে বসায়। দোভাষীর মাধ্যমে আলোচনা আরম্ভ হয়। যৎকিঞ্চিত কথোপকথনের পর বাহান ভাষণের রীতিতে বক্তব্য আরম্ভ করে। হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রশংসার পর কায়সারের নাম নিয়ে দর্পের সুরে বলে, আমাদের বাদশাহ্ রাজাধিরাজ। দোভাষী তার এই বাক্যের পুরো অনুবাদ করার পূর্বেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) বাহান-কে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তোমাদের সম্রাট হয়তো এমনই, কিন্তু যে ব্যক্তিকে আমরা নেতা বানিয়েছি, এক মুহূর্তের জন্যও যদি তার মনে বাদশাহ্ হওয়ার বাসনা জাগে, আমরা তৎক্ষণাত তাকে পদচ্যুত করব। বাহান পুনরায় ভাষণ আরম্ভ করে এবং দম্ভভরে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদের বর্ণনা দিয়ে বলে, আরবের অধিবাসী তোমাদের জাতি আমাদের দেশে এসে বসতি স্থাপন করেছে। আমরা তাদের সাথে সর্বদা বন্ধুসুলভ ব্যবহার করেছি। আমরা ভেবেছিলাম, এই সুযোগসুবিধা প্রদানের কারণে গোটা আরব কৃতজ্ঞ হবে কিন্তু উল্টো তোমরা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে সেনাসমাবেশ করছ আর আমাদেরকে আমাদের-ই দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চাইছ! তোমাদের জানা নেই যে, ইতিপূর্বে বহু জাতি এমন আকাঙ্খা করেছে কিন্তু কখনও সফল হয় নি। পৃথিবীতে তোমাদের মত অজ্ঞ, বর্বর আর সহায়সম্বলহীন কোন জাতি নেই, এখন তোমাদের এত স্পর্ধা, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী আচরণ করছ! এরপরও আমরা তোমাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখছি উপরন্তু যদি তোমরা এখান থেকে চলে যাও তবে পুরস্কার হিসেবে সেনাপ্রধানকে দশ হাজার দিনার, সেনা-অফিসারদের হাজার দিনার এবং সাধারণ সেনাদেরকে শত দিনার করে দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে, তারাই মুসলমানদের হত্যা করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্য-সমাবেশ ঘটিয়েছিল। কিন্তু তারা যখন অনুধাবন করল যে, এ যুদ্ধে জয় লাভ করা সহজসাধ্য হবে না তখন এসব শর্ত উপস্থাপন করল। যাহোক, বাহান যখন তার বক্তব্যে ইতি টানল তখন খালিদ উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্‌র গুণকীর্তনের পর বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা অত্যন্ত ধনী ও সম্পদশালী এবং ক্ষমতার বাগডোর তোমাদের হাতে। আর তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী আরবদের সাথে যে ব্যবহার করেছ সে বিষয়েও আমরা অবগত আছি। কিন্তু এটি তাদের প্রতি তোমাদের কোন অনুগ্রহ ছিল না বরং তোমাদের ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র একটি কৌশল ছিল মাত্র। তোমরা তোমাদের ধর্মের প্রসার করতে চাচ্ছিলে যার ফলে সেই আরবরা ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হয়ে গেছে এবং আজ তারা স্বয়ং আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কথা সত্য যে আমরা পূর্বে দরিদ্র, অভাবী ও যাযাবর ছিলাম। আমাদের অজ্ঞতা ও অমানিশা এমন পর্যায়ের ছিল যে, যারা শক্তিশালী ছিল তারা দুর্বলদের পিষে ফেলত। গোত্রগুলো পরস্পর লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু খোদা তা'লা আমাদের প্রতি দয়া করেছেন আর আমাদের জাতির মাঝ থেকেই এক নবী আমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন যিনি আমাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা সৎ, সর্বাধিক উদার এবং সবচেয়ে পবিত্র মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তিনি আমাদের তওহীদ শিখিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই। তিনি স্ত্রী-সন্তান লালন করেন না, তিনি এক-অদ্বিতীয়। তিনি আমাদের এ নির্দেশও প্রদান করেছেন, আমরা যেন এসব শিক্ষা পুরো জগতের সামনে উপস্থাপন করি। যে ব্যক্তি এ শিক্ষা মেনে নিবে, সে মুসলমান ও আমাদের ভাই। আর যে ব্যক্তি ইসলামের এ শিক্ষা মানবে না কিন্তু জিযিয়া কর প্রদান করবে, আমরা তার তত্ত্বাবধায়ক এবং নিরাপত্তা প্রদানকারী। আর যারা এ দুটির কোনটিই মানতে প্রস্তুত নয়, তার জন্য তরবারি ধারণের বিকল্প নেই। মানবে না আবার যুদ্ধও করবে এমতাবস্থায় আমরাও প্রস্তুত আছি। বাহান জিযিয়া করের কথা শুনে এক দীর্ঘশ্বাস নেয় এবং নিজ সৈন্যদের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, এরা মরবে তবু জিযিয়া কর প্রদান করবে না। আমরা জিযিয়া নিই, দিই না। বস্তুত কোন নিষ্পত্তি হয়নি, খালিদ উঠে চলে আসেন। তারপর সেই শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল যার পর রোমানরা আর সামলে উঠতে পারে নি। হযরত খালিদ (রা.) চলে আসলে বাহান সর্দারদের একত্রিত করে বলল, তোমরা শুনেছ, আরবদের দাবি হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের প্রজা না হবে ততক্ষণ তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে না। তোমরা কি তাদের দাসত্ব বরণ করে নিতে রাজি আছ? সকল সেনাকর্মকর্তা অত্যন্ত আবেগের সাথে বলল, আমরা মরব তবুও এই লাঞ্ছনা বরণ করতে পারব না। ভোর হলে রোমানরা সেই উচ্ছ্বাস ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে বের হল যা দেখে মুসলমানরাও অবাক হয়। হযরত খালিদ (রা.) এটি দেখে আরবের সাধারণ রীতির বাইরে গিয়ে নতুনভাবে সৈন্যবাহিনী সাজালেন। হযরত খালিদ (রা.) যখন দেখলেন, রোমানরা সেই জোশের সাথে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বের হয়েছে তখন তিনি আরবের যে সাধারণ যুদ্ধরীতি ছিল তার বিপরীতে একটি নতুন পদ্ধতিতে সৈন্যবাহিনী সামনে সাজালেন। আর ৩০-৩৫ হাজারের মত যে সৈন্যসংখ্যাই ছিল সেটিকে ৩৬ ভাগে বিভক্ত করেন এবং সামনে পিছনে সুসজ্জিত সারি তৈরি করেন। মধ্যবর্তী বাহিনীর দায়িত্ব হযরত আবু উবায়দাকে দেন, ডানদিকের দায়িত্বে হযরত আমর বিন আস (রা.) এবং শারাহবিল (রা.) নিযুক্ত হন আর বামদিকের নেতৃত্বে ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান ছিলেন। এছাড়া প্রতিটি সারিতে বাছাই করা পৃথক পৃথক অফিসার তাদের নিযুক্ত করেন যারা বীরত্ব এবং যুদ্ধকৌশলে বিশেষ খ্যাতি রাখতেন। বক্তাগণ যারা নিজেদের বক্তৃতার জোরে মানুষের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতেন অর্থাৎ এমন সুবক্তা ছিলেন যারা মানুষকে উজ্জীবিত করতেন তাদেরকে নিযুক্ত করা হয় যাতে তারা তাদের জোরালো ভাষণের মাধ্যমে সৈন্যবাহিনীকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। তাদের মাঝে আবু সুফিয়ানও ছিলেন যিনি সৈন্যদের সামনে এই বাক্যাবলী বলতেন, খোদার কসম! তোমরা আরবদের প্রতিরক্ষক ও ইসলামের সাহায্যকারী পক্ষান্তরে তারা কেবল রোমের প্রতিরক্ষক এবং শিরকের সাহায্যকারী। হে আল্লাহ্! এই দিনটি তোমার দিবসসমূহের মাঝে একটি। হে আল্লাহ্! তোমার বান্দাদের প্রতি তুমি সাহায্য অবতীর্ণ করো। হযরত আমর বিন আস (রা.) বলতেন, হে লোকসকল! তোমরা নিজ দৃষ্টি অবনমিত রাখ এবং হাঁটু গেড়ে বসে যাও। আর নিজেদের বর্শাগুলোকে তাক করে ধরো এবং নিজ নিজ স্থানে ও সারিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও। শত্রুরা যখন আক্রমণ করে তখন তোমরা তাদেরকে ততক্ষণ অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা বর্শার ডগায় আসে। অতঃপর তাদের উপর সিংহের মত ঝাপিয়ে পড়ো। সেই খোদার কসম! যিনি সত্যকে ভালবাসেন এবং তাতে পুণ্য প্রদান করেন; যিনি মিথ্যায় অসন্তুষ্ট হন এবং এর জন্য শাস্তি প্রদান করেন আর তিনি অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই আমি এই সংবাদ লাভ করেছি যে, মুসলমানেরা গ্রামের পর গ্রাম এবং অট্টালিকার পর অট্টালিকা বিজয় করে এই দেশ জয় করবে। সুতরাং তাদের জনবল এবং তাদের সংখ্যা দেখে তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমরা যদি অবিচলতার সাথে যুদ্ধ করো তাহলে এরা তিতির পাখির ছানার মত ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

মুসলমান সেনাসংখ্যা যদিও কম ছিল অর্থাৎ ৩০-৩৫ হাজারের বেশি ছিল না কিন্তু সমস্ত আরবের মধ্যে বাছাইকৃত লোকগুলোই ছিল। তাদের মধ্যে বিশেষ বুযূর্গ যারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা দর্শন করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার। বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করা সাহাবীর সংখ্যা ছিল ১ শত। আরবের বিখ্যাত গোত্রগুলোর মাঝে কেবল আযদ গোত্রেরই ১০ হাজার মানুষ ছিল। হিমীর গোত্রের একটি বৃহৎ দল ছিল। হামদান, খওলান, লাহাম, জুযাম প্রভৃতি গোত্রের বিখ্যাত সাহসী ব্যক্তিরা ছিল। এই যুদ্ধাভিযানের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, মহিলারাও এতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে। আমীর মুআবিয়া'র মা, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, হিন্দ অর্থাৎ হযরত হিন্দ যিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি আক্রমণ করতে করতে সামনে অগ্রসর হতেন আর বলতেন, তোমরা এসব কাফেরকে নিজেদের তরবারী দিয়ে টুকরো টুকরো করে দাও। একইভাবে আবু সুফিয়ানের মেয়ে এবং আমীর মুআবিয়া'র বোন জোআয়রিয়া একটি দলের সাথে বেরিয়ে তার স্বামীর সাথে মিলে রোমান সেনাদের মোকাবিলা করেন আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শহীদ হন। মিকদাদ যার কণ্ঠ ছিল খুবই সুললিত, তিনি সেনাদের সম্মুখভাগে থেকে সূরা আনফালের যেসব আয়াতে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো তিলাওয়াত করছিলেন।

অপরদিকে রোমানদের উত্তেজনার যে চিত্র ছিল তা হলো, ত্রিশ হাজার সৈন্য নিজেদের পায়ে শেকল পরে নিয়েছিল যেন পিছু হটার চিন্তাও না আসে। অর্থাৎ নিজেদের পা একে অপরের সাথে বেঁধে নেয়।

যুদ্ধের সূচনা রোমানদের পক্ষ থেকে হয়। পঞ্জাপালের ন্যায় দুই লক্ষ সৈন্য নিয়ে একযোগে অগ্রসর হয়। হাজার হাজার পাদ্রী এবং বিশপ হাতে ক্রুশ নিয়ে সামনে অগ্রসর হয় এবং 'হযরত ঈসার জয়' ঈসার জয় স্লোগান দিয়ে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এইরূপ অবস্থা দেখে একজনের মুখ থেকে অবলিলায় বেরিয়ে পড়ে যে, আল্লাহু আকবার কী বিশাল সৈন্যবাহিনী! হযরত খালেদ জোশের সাথে বলেন, চুপ কর। খোদার কসম! আমার ঘোড়ার খুর যদি ভালো থাকতো তাহলে আমি বলে দিতাম, খ্রিস্টানরা যেন সমপরিমাণ সৈন্য আরো বৃদ্ধি করে। মোটকথা খ্রিস্টানরা প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে আক্রমণ করে এবং তিরের বৃষ্টি বর্ষণ করে সামনে এগিয়ে আসে। মুসলমানরা অনেকক্ষণ অবিচল থাকে কিন্তু এত প্রকট আক্রমণ ছিল যে, মুসলমান সৈন্যবাহিনীর ডান পাশের উইং সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর তারা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যায়। ছত্রভঙ্গ পরাজিত এই দলটি পিছু হটতে হটতে মহিলাদের তাবুর কাছে গিয়ে পৌঁছে। মহিলারা মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে চরম ক্ষুব্ধ হয় আর তাবুর কাঠ-খড়ি উঠিয়ে হাতে নেয় এবং বলে যে, অকৃতকার্যের দল! এদিকে আসলে এই কাঠ-খড়ি দিয়ে তোমাদের মাথা ফাটিয়ে দিব। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা লাঠি হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে আসেন তার সাথে অন্যান্য মহিলারাও তার অনুসরণ করে সামনে এগিয়ে আসে। হিন্দা আবু সুফিয়ানকে পলায়ন করতে দেখে তার ঘোড়ার মুখে চোখা খুঁটির আঘাত মেরে বলে যে, কোথায় যাচ্ছ? ফিরে আস আর যুদ্ধক্ষেত্রে যাও।

একইভাবে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হিন্দা লাঠি হাতে নিয়ে আবু সুফিয়ানের দিকে যায় এবং বলে, খোদার কসম! তুমি সত্য ধর্মের বিরোধিতা করায় এবং খোদার সত্য রসূলকে অস্বীকার করায় খুবই কঠোর ছিলে। সত্য ধর্মের নাম সমুন্নত করা এবং আল্লাহ্‌র রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করা ও খোদার দৃষ্টিতে সফলকাম হওয়ার আজই সুবর্ণ সুযোগ।

আবু সুফিয়ানের আত্মসম্মানবোধে প্রচণ্ড আঘাত আসে আর উল্টোপায়ে হাতে নগ্ন তরবারি নিয়ে পঙ্গপালসদৃশ শত্রুসেনার মাঝে ঢুকে যায়। আরেকজন সাহসী নারী যার নাম ছিল খওলা। তিনি এই পঙ্ক্তি পাঠ করে মুসলিম সেনাবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করতেন

يَاهَارِبًا عَنْ نِسْوَةٍ تَقِيَّاتِ فَعَنْ قَلِيْلٍ مَا تَرَى سَبِيَّاتِ وَلَا حَظِيَّاتٍ وَلَا رَضِيَّاتِ

হে মুত্তাকী নারীদের ছেড়ে পলায়নকারী! অচিরেই তুমি তাদেরকে বন্দী দেখতে পাবে। তারা উন্নত মর্যাদাশালী হবে না আর তারাও পছন্দনীয় হবে না। এই অবস্থা দেখে হযরত মুয়ায বিন জাবল যিনি সৈন্যবাহিনীর ডান দিকের এক অংশের সেনাপতি ছিলেন নিজ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন এবং বলেন, আমি পদাতিক হিসাবেই যুদ্ধ করবো কিন্তু কোন বীর যোদ্ধা যদি এই ঘোড়ার প্রতি সুবিচার করতে পারে তবে ঘোড়া উপস্থিত আছে। তার ছেলে বলল, হ্যাঁ আমি এ দায়িত্ব পালন করবো। কেননা আমি আরোহী অবস্থায় ভালো যুদ্ধ করতে পারি। অবশেষে পিতা পুত্র উভয়েই সৈন্যদের মাঝে ঢুকে যান আর এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যে, মুসলমানদের দোদুল্যমান পা সুদৃঢ় হয়ে যায়। সেই সাথে যবায়দা গোত্রের নেতা হিজাজ পাঁচশত সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয় এবং যে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করছিল তাদেরকে থামিয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর ডান দিকে আযদ গোত্র আক্রমণের সূচনা থেকেই অবিচল ছিল। খ্রিস্টানরা যুদ্ধে পুরো শক্তি তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয় কিন্তু তারা পর্বতের ন্যায় অবিচল থাকে। এমন ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছিল যে, সেনাবাহিনীর চতুর্দিকে মাথা, হাত, বাহু প্রভৃতি কর্তিত হয়ে একের পর এক ঝরছিল কিন্তু মুসলমানদের অবিচলতায় কোন চিড় ধরে নি। আমর বিন তোফায়েল যিনি গোত্রের নেতা ছিলেন তরবারি দিয়ে আঘাত করছিলেন আর হুঙ্কার দিচ্ছিলেন যে, আযদীরা দেখো, তোমাদের কারণে মুসলমানদের ওপর যেন কলঙ্ক লেপিত না হয়। বিশিষ্ট নয়জন বীর সৈনিক তার হাতে নিহত হয় এবং অবশেষে তিনি নিজেও শহীদ হয়ে যান।

হযরত খালিদ তার বাহিনীকে পেছনে লাগিয়ে রেখেছিলেন। অকস্মাৎ বূহ্য ভেদ করে তারা বাইরে বেরিয়ে আসে এবং এত প্রবল আক্রমণ হানে যে, রোমানদের সারিসমূহের শৃংখলা নষ্ট করে দেয়। আবু জাহলের পুত্র ইকরামা ঘোড়া নিয়ে সামনে এগিয়ে আসেন আর বললেন, হে খ্রিস্টানেরা! আমি এক সময় আমার অবিশ্বাসের যুগে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিপক্ষে লড়াই করেছি। এখন তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি পশ্চাদপসরণ করবো এটি কী কোনভাবে সম্ভব? একথা বলে সৈন্যবাহিনীর দিকে তাকালেন এবং বললেন, মৃত্যুর শর্তে কে বয়আত করতে চায়?

চারশত ব্যক্তি যাদের মাঝে যিরার বিন আযাদও ছিলেন মৃত্যুর শর্তে বয়আত করলেন এবং এতটা অবিচলতার সাথে লড়াই করেন যে, প্রায় সকলেই সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইকরামার মৃতদেহ লাশের স্তুপে পাওয়া যায়। তখনো কিছুটা শ্বাসপ্রশ্বাস চলছিল, খালিদ নিজ উরুতে তার মাথা রাখেন এবং মুখে সামান্য পানি ঢেলে বলেন, খোদার কসম! উমর (রা.)-এর ধারণা ভুল ছিল যে, আমরা শহীদের মৃত্যু মরব না। মোটকথা ইকরামা এবং তার সাথী যদিও মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু রোমানদের সহস্র সহস্র লোককে হত্যা করেছেন।

খালিদের আক্রমণ তাদের শক্তি আরো চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পিছু হটতে হয় আর খালিদ তাদের পিছু হটাতে হটাতে সেনাপ্রধান দুরানজারের কাছে পৌঁছে যায়। দুরানজার ও রোমান সেনা অফিসাররা চোখে রুমাল বেধে দেয় যেন এই চোখ বিজয় প্রত্যক্ষ না করলে পরাজয়ের সাক্ষী যেন না হয়। ঠিক সেই সময় যখন ডান বাহুতে চরম যুদ্ধ হচ্ছিল তখন রোমানদের ডান উইং-এর সর্দার ইবনে কানাতির মুসলিম বাহিনীর বাম বাহুর ওপর আক্রমণ করল। দুর্ভাগ্যবশত এই অংশে অধিকাংশ লাহাম ও গুসসান গোত্রের লোক ছিল যারা সিরিয়ার বিভিন্ন দিকে বসবাস করত এবং এক সময় পর্যন্ত রোমানদের কর দিত। রোমানদেরকে ট্যাক্স দিত। তাই রোমানভীতি যা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল তার এমন প্রভাব পড়ে যে, প্রথম আক্রমণেই তাদের পা হড়কে যায়। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সেই পুরোনো ত্রাস বিদ্যমান ছিল। এতে ভীত হয়ে তাদের পা হড়কে যায়। কিন্তু যাহোক অফিসাররা সাহস দেখায়। যদি অফিসাররা ভীতি প্রকাশ করত তাহলে লড়াই সেখানেই শেষ হয়ে যেত। রোমানরা ধাওয়া করতে করতে শিবিরের কাছে পৌঁছে যায়। মহিলারা এই অবস্থা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে এবং তাদের সাহসিকতা খ্রিস্টানদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর শৃংখলা যদিও হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অফিসারদের মধ্যে কুবাস বিন আশিয়াম, সাইদ বিন যায়েদ, ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান, আমর বিন আস, শারাহবিল বিন হাসানা প্রমুখ বীরত্বের প্রশংসা করে যাচ্ছিলেন। কুবাসের হাত থেকে তরবারি এবং বর্শা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছিল, কিন্তু তার অবিচলতায় এতটুকু চিড় ধরতো না। বর্শা ভেঙ্গে পড়ে গেলে বলতেন, কেউ আছে কি যে সে ব্যক্তিকে অস্ত্র সরবরাহ করবে? যে খোদার সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, সে রণক্ষেত্র থেকে বের হলে মরেই বের হবে। মানুষ দ্রুত তার হাতে তরবারি বা বর্শা এনে দিত এবং এরপর তিনি সিংহের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে শত্রুদের উপর হামলে পড়তেন। আবুল আওয়ার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন এবং নিজ অধীনস্ত সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন, ধৈর্য ও অবিচলতা পৃথিবীতে সম্মান বয়ে আনে এবং এর পরিণামে কৃপা রয়েছে। স্মরণ রেখ! এই সম্পদ যেন হাতছাড়া না হয়। সাইদ বিন যায়েদ রাগান্বিত হয়ে হাঁটুগেড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রোমানরা তার দিকে অগ্রসর হলে সিংহের ন্যায় আক্রমণ করেন এবং সামনের অফিসারকে মেরে ভূপাতিত করেন। মুয়াবিয়ার ভাই ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান অনেক দৃঢ়তার সাথে লড়াই করছিলেন। ঘটনাচক্রে তার পিতা আবু সুফিয়ান যিনি সেনাদের উজ্জীবিত করছিলেন তার দিকে আসলেন এবং পুত্রকে দেখে বললেন, হে আমার পুত্র! এখন রণক্ষেত্রে প্রত্যেক সেনা বীরত্বের সাক্ষর রাখছে। তুমি সেনাপ্রধান আর সাধারণ সেনাদের তুলনায় বীরত্ব প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমার বেশি। তোমার বাহিনীর কোন এক সৈন্যও যদি এই রণক্ষেত্রে তোমার চেয়ে অধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করে, তবে তা তোমার জন্য লজ্জার কারণ হবে। শারাহবিলের অবস্থা ছিল, চতুর্দিক থেকে রোমান কর্তৃক পরিবেষ্টিত ছিলেন আর তিনি মাঝখানে পাহাড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন এবং কুরআনের এই আয়াত পড়ছিলেন,

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ (التوبۃ:111)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের ধন-সম্পদ এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; কেননা তারা আল্লাহ্'র পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং হয় তারা আপন শত্রুদের হত্যা করে নতুবা স্বয়ং (শত্রুর হাতে) নিহত হয়। (সুরা তওবা: ১১১)

আর এই নারা বা শ্লোগান দিচ্ছিল যে, খোদার সাথে (যারা) ব্যবসা করতে চায় এবং (যারা) খোদার ছায়ায় থাকতে চায়, তারা কোথায়? এই ধ্বনি যে কানে পড়েছে সে-ই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি উপড়ে পড়া সৈন্যবাহিনী পুনরায় সুসজ্জিত হয়ে যায় এবং শুরাহ্‌বিল তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন যে, রোমানরা, যারা যুদ্ধের ময়দানে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছিল, (তারা) থেমে যায়। এদিকে মুসলমান নারীরা তাদের তাঁবু থেকে বের হয়ে (মুসলিম) সৈন্যবাহিনীর পিছনে এসে দাঁড়ায় এবং চিৎকার করে বলতো যে, যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন কর তবে আমাদেরকে মুখ দেখাবেনা। তখন পর্যন্ত উভয়পক্ষ সমানতালে যুদ্ধ করছিল, বরং জয়ের পাল্লা রোমানদের দিকেই অধিক ঝুঁকে ছিল। কায়েস বিন হুওয়াইরা, যাকে খালিদ সৈন্যবাহিনীর একাংশ দিয়ে বাম উইং-এর পিছনের অংশে নিযুক্ত করেছিল, তারা আকস্মিকভাবে পিছন দিক হতে বের হয়ে এরূপ প্রচন্ড আক্রমণ চালান যে রোমান নেতারা (এই আক্রমণ) প্রতিহত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও তাদের সৈন্যবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হয় নি। পুরো সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং বিচলিত হয়ে পিছু হটে যায়। একই সাথে সাঈদ বিন যায়েদ মাঝখান থেকে বের হয়ে আক্রমণ চালান। রোমানরা অনেক দূর পর্যন্ত পিছু হটতে থাকে, এমনকি মাঠের এক প্রান্তে যে নর্দমা ছিল তার কিনারায় চলে আসে। মুহূর্তের মধ্যে সেই নর্দমা তাদের লাশে পূর্ণ হয়ে যায় এবং যুদ্ধের ময়দান সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে মহান বিজয় দান করেন।

এ যুদ্ধের এই ঘটনা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, যখন প্রচন্ড যুদ্ধ হচ্ছিল তখন হাব্বাস বিন কায়েস, যিনি একজন সাহসী সৈনিক ছিলেন, প্রাণপণে লড়াই করে যাচ্ছিলেন, সে সময় তার পায়ে কেউ তরবারী দিয়ে আঘাত করে এবং এক পা কেঁটে গিয়ে পৃথক হয়ে যায়। হাব্বাস তা ঘুনাক্ষরেও অনুধাবন করতে পারে নি। কিছুক্ষণ পর সম্বিত ফিরে পেতেই খুঁজে বেড়ান যে, আমার পায়ের কী হল? মনে পড়ল যে, দেখি তো আমার পা কোথায়, (অর্থাৎ) পায়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, পা নেই। তার গোত্রের লোকেরা এই ঘটনার জন্য সর্বদা গর্ববোধ করতো।

রোমানদের নিহতের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাবারীর ও আযদীর মতে এই সংখ্যা লক্ষাধিক এবং বালাযুরী সত্তর হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা তিন হাজার, যাদের মধ্যে ছিলেন ইকরামা, যিরার বিন আযহার, হিশাম বিন আসী, আবান বিন সাঈদ প্রমুখ ছিলেন। রোমান সম্রাট সিজার আন্তাকিয়ায় থাকা অবস্থাতেই পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ কনস্টানটিনোপোল চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। যাওয়ার সময় সিরিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, 'বিদায় হে সিরিয়া।' আবু উবায়দা বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর নিকট পত্র লিখেন এবং ছোট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন, যাদের মধ্যে হুযায়ফা বিন ইয়ামান-ও ছিলেন। হযরত উমর (রা.) ইয়ারমুকের যুদ্ধের সংবাদপ্রাপ্তির অপেক্ষায় কয়েকদিন ধরে ঘুমান নি। বিজয়ের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি তৎক্ষণাত সিজদাবনত হন এবং খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

(আল ফারুক, প্রণেতা-শিবলী নোমানী, পৃ: ১১৯-১৩০) (আল ইকতিফা বিমা তাযমিনা মিন মাগাযি রুসুলুল্লাহ (সা.) ওয়াস সালাসাতিল খুলাফা, ২য় ভাগ, পৃ: ২৭১) (ফুতুহুশ শাম, প্রণেতা-ওয়াকিদ, ১ম ভাগ, পৃ: ২৪২) (তারিখুত তাবারী লি ইবনে হারির, ২য় ভাগ, পৃ: ৩৩৮) (তারিখে ইসলাম কি বাহাদুর

খোয়াতিন, পৃ: ১১৬, প্রণেতা- মৌলানা সানাউল্লাহ্ সাআদ, শুজা আবাদী) (আল বাদায়াতু ওয়ান নিহাইয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৫৬০, দারে হিজর, ১৯৯৮)

ইয়ারমুকের যুদ্ধের কারণে হিমস থেকে ইসলামী সেনাবাহিনীকে সাময়িকভাবে পিছু হটতে হয়েছিল, আর তাই তাদের কাছ থেকে নেওয়া জিযিয়া ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়টি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে উল্লেখ করেছেন :"সাহাবীরা যখন রোমান সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং অগ্রসর হতে হতে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্থান জেরুজালেম করায়ত্ব করে নেয়, আর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন তখন খ্রিস্টানরা দেখল যে তাদের ধর্মীয় কেন্দ্রও মুসলমানদের করতলগত হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা সেখান থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চূড়ান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর সংকল্প করে এবং চতুর্দিকে ধর্মীয় যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে খ্রিস্টানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে আর বিশাল সৈন্যবাহিনী একত্রিত করে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রোমানদের এরূপ তীব্র আক্রমণের মুখে মুসলমান যাদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই স্বল্প , সাময়িকভাবে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেয়। আর ইসলামী সেনাপ্রধান হযরত উমর (রা.)- কে লিখেন, শত্রুদের সংখ্যা এত বিশাল এবং আমাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তাদের সাথে লড়াইয়ে যাওয়া নিজ বাহিনীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর।কাজেই আপনি অনুমতি দিলে সঠিক রণপ্রস্তুতি এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছোট করার উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনী পিছু হটে আসবে যাতে পুরো বাহিনীকে একত্র করে মোকাবিলা করা যায় আর একই সাথে লিখেন, যেসব অঞ্চল আমরা জয় করেছি সেখানকার মানুষের কাছ থেকে করও নিয়ে রেখেছি, এখন যদি আপনি এসব অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেন তাহলে এটিও বলে দিবেন যে, এই কর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী? হযরত উমর (রা.) উত্তর দেন, যুদ্ধক্ষেত্র ছোট করতে এবং মুসলমানদের শক্তিকে সুসংহত করার জন্য পিছু হটা ইসলামী শিক্ষা বহির্ভূত নয়, কিন্তু স্মরণ রাখবেন! এসব অঞ্চলের লোকদের কাছ থেকে এই শর্তে কর আদায় করা হয়েছিল যে, মুসলিম সেনাবাহিনী তাদের নিরাপত্তা বিধান করবে। কিন্তু মুসলিম সেনাবাহিনী যখন পিছু হটবে তখন এর অর্থ হবে, তারা এসব অঞ্চলের নিরাপত্তা দিতে পারবে না। এজন্য যার কাছ থেকেই যা কিছু নেওয়া হয়েছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। হযরত উমর (রা.)-এর এ নির্দেশ পৌঁছনোর পর মুসলিম সেনাপ্রধান সেসব অঞ্চলের দায়িত্বশীল লোক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য লোকদের ডেকে তাদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থ ফেরৎ দিয়ে দেন আর তাদেরকে বলেন, আপনাদের নিরাপত্তার জন্য মুসলিম সেনাবাহিনী আপনাদের কাছ থেকে এই অর্থ নিয়েছিল কিন্তু এখন যেহেতু শত্রুর মোকাবিলায় নিজেদেরকে আমরা দুর্বল পাচ্ছি এবং কিছু দিনের জন্য সাময়িকভাবে পিছু হটে যাচ্ছি আর এজন্য আপনাদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারছি না, তাই এসব অর্থ আমাদের কাছে রাখা সঙ্গত নয়।

এটি এমন একটি দৃষ্টান্ত ছিল যা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন রাজা বাদশাহ দেখায় নি। কোন বাদশাহ যখন কোন অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তখন আদায়কৃত কর ও এধরণের জিনিস ফিরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সেসব অঞ্চলে আরো লুটতরাজ চালায়। তারা মনে করে, এখন তো এসব অঞ্চল অন্যের হাতে চলে যাবে তাই আমরা এখান থেকে যতটা লাভবান হতে পারি হওয়া উচিত। এছাড়া তারা যেহেতু সেখানে থাকবে না, তাই দুর্নামেরও কোন ভয় থাকে না আর যদি কোন চরম পর্যায়ের সুশৃঙ্খল সরকার হয়ে থাকে তাহলে তারা সর্বোচ্চ যা করে তাহলে নীরবে সেনাবাহিনীকে পিছু হটিয়ে দেয় এবং খুব একটা লুটতরাজ করতে দেয় না। কিন্তু মুসলিম সেনাবাহিনী যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি কেবল হযরত উমর (রা.)-এর যুগেই দৃষ্টিগোচর হয়, বরং পরিতাপের বিষয় হলো পরবর্তী যুগও যদি এর সাথে যুক্ত করা হয় তবে এমন কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া যায় না যে, কোন বিজয়ী বাদশাহ কোন অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার সময় সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা কর, জিযিয়া এবং অর্থসম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছে। খ্রিষ্টানদের ওপর এর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, যদিও তাদের স্বধর্মীয় সেনাবাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল এবং হামলাকারী তাদের স্বজাতির জেনারেল , কর্ণেল ও সেনাকর্মকর্তা সমন্বয়ে ছিল আর সৈন্যরা তাদের ভাই ছিল; এছাড়াও এ যুদ্ধকে খ্রিষ্টানদের জন্য ধর্মীয় যুদ্ধের রূপ দেওয়া হয়েছিল আর খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় কেন্দ্র যা তাদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে চলে গিয়েছিল এখন সেটির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা হচ্ছিল তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টান নারীপুরুষেরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কেঁদে কেঁদে মুসলমানদের পুনরায় ফিরে আসার জন্য দোয়া করছিল।" (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৪, পৃ: ১৫-১৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ইতিহাসের গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি মনে করতেন, হযরত উমর (রা.) কে জিজ্ঞেস করেই পিছিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে এবং কর ও অর্থসম্পদ যা ছিল তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত ইকরামা (রা.) সম্পর্কে বলেন,হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইয়ারমুকের যুদ্ধে মহানবী (সা.) -এর সাহাবীদের জীবন যখন সঙ্কটাপন্ন ছিল এবং বহু মুসলমান মারা যাচ্ছিল তখন মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হযরত আবু উবায়দা বিনুল জারাহ্ বলেন, আমি চাই এমন কিছু বীর যোদ্ধা বেরিয়ে আসুক যারা সংখ্যায় কম হলেও জীবন বাজি রেখে রোমান সেনাবাহিনীর মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করবে। তখন হযরত ইকরামা (রা.) সামনে এগিয়ে এসে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, আমাকে আমার মর্জি মত কিছু মানুষ নির্বাচন করতে দিন। আমি সেই লোকদের সাথে নিয়ে শত্রুসেনার মূলকেন্দ্রে আক্রমণ করব এবং চেষ্টা করব আর তাদের জেনারেলকে হত্যা করার চেষ্টা করব। সে সময় রোমান বাহিনীর জেনারেল খুব আক্রমণাত্মকভাবে লড়াই করছিল আর বাদশাহ তার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, যদি সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে তবে সে তার কাছে তার মেয়ে দিবে এবং তার অর্ধেক রাজ্য তার নামে লিখে দিবে। এই লালসার কারণে সে খুবই উত্তেজিত ও উজ্জীবিত ছিল আর নিজস্ব ও শাহী সেনাদল নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েছিল, এছাড়া সে সৈন্যদের সাথে বড় অঙ্কের প্রতিশ্রুতিও দিয়ে রেখেছিল। তাই রোমান বাহিনীও প্রাণপণ যুদ্ধ করছিল। রোমান সেনাবাহিনী যখন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তখন সেই জেনারেল সৈন্যবাহিনীর মূলকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ছিল।

হযরত ইকরামা চারশত লোক নিয়ে সেনাবাহিনীর ঠিক কেন্দ্র বরাবর আক্রমণ করে এবং তার সাথীদের মধ্যে হতে একজন সেই জেনারেলের ওপর আক্রমণ করে তাকে ভূ-পাতিত করে। অপর দিকে ছিল লক্ষাধিক সৈন্য ছিল কিন্তু এরা ছিলেন মাত্র চারশত জন মুসলমান। এ কারণে মোকাবিলা করা সহজ ছিল না। এই জেনালেরকে তো তারা হত্যা করেন আর তার মৃত্যুর ফলে সেনাবাহিনীও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু শত্রুরা এদের ওপর হামলে পড়ে, ফলে অল্প কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই শহীদ হয়ে যান। এদের মধ্যে বারোজন গুরুতর আহত ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর বিজয় অর্জনের পর এসব লোকের সন্ধান করা আরম্ভ হয়। এই বারোজন আহত লোকের মাঝে হযরত ইকরামাও ছিলেন। এক মুসলিম সৈনিক তার কাছে আসে, তখন তার অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল। সে বলে, ইকরামা আমার কাছে পানির মশক আছে, তুমি একটু পানি পান করে নাও। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন, কাছেই হযরত আব্বাসের পুত্র ফযল পড়ে ছিলেন। তিনিও গুরুতর আহত ছিলেন। ইকরামা বলেন, আমার আত্মাভিমান এটি সহ্য করতে পারে না যে, আমি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘোর বিরোধী ছিলাম তখন যারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন আজ তারা এবং তাদের সন্তানরা পিপাসায় মৃত্যুবরণ করবে আর আমি পানি পান করে জীবিত থাকব। প্রথমে তাদেরকে পানি পান করাও। এরপর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা আমার কাছে নিয়ে এসো। সুতরাং সেই মুসলমান ফযলের কাছে যায়, কিন্তু তিনি আরেক আহত ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন, প্রথমে তাকে পান করাও, কেননা আমার চেয়েও তার বেশি প্রয়োজন। তখন সে পরবর্তী আহত ব্যক্তির নিকট গেলে সে তাকে বলে, আমার চেয়ে তার দরকার বেশি, আগে তাকে পান করাও। এভাবে সে যে সৈন্যের কাছেই যায় সে তাকে আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দেয় আর কেউই পানি পান করে নি। সে যখন শেষ আহত ব্যক্তির কাছে যায় তখন সে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাই সে যখন ইকরামার কাছে ফিরে যায় ততক্ষণে তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। অবশিষ্ট আহতদের অবস্থাও একই হয়েছিল। যার কাছেই সে যায় তাকে মৃত পায়।

(হর আহমদী অউরাত আহমদীয়াত কি সাদাকাত কা এক জিন্দা নিশান হ্যায়, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৬, পৃ: ২২৯-২৩১) এটি ছিল এই যুদ্ধের ফলাফল। আল্লাহ্ তা'লা এভাবে বিজয় দান করেন। যাহোক এই স্মৃতিচারণ এখনো চলছে আর ভবিষ্যতেও অব্যহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

****

শোক সংবাদ

অতীব দুঃখের সহিত জানাচ্ছি, বেহালা (কলিকাতার) প্রবীণ আহমদী জনাব শোহরায়ে আলম সাহেব ৮৮ বৎসর বয়সে গত ইং ২৪ শে জুলাই,২০১২১ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মরহুম যৌবনে অত্যন্ত প্রতিকূল ও চরম বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হয়েও ঈমানে অবিচল ছিলেন। সদালাপী, নামায, রোযা, তাহাজ্জুদ ও নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। আবেগপ্রবণ ঐ ব্যক্তিটির তবলীগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বিভিন্ন সেবামূলক কাজের সহিত জড়িত ছিলেন। প্রায়ই প্রতি বৎসর কাদিয়ানে জলসা সালানা ও ইজতেমায় যোগদান করতেন। যৌবনে রাবওয়ায় মোসলেহ মওউদ (রা.) এর সাথে তাঁর সাক্ষাতলাভের সুযোগ হয়েছিল। প্রথমে তাঁর ছিল সারে আলম। মোসলেহ মওউদ (রা.) তা সংশোধন করে 'শোহরায়ে আলম' রাখেন। পরবর্তীতে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খলীফার সাথেও সাক্ষাতের সুযোগ হয়। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্তমানে বড়িশা জামাতের প্রেসিডেন্ট। তাঁর মাগফেরাত ও আত্মার উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

সংবাদদাতা: মোরতোজা আলি, বড়িশা জামাত।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 21 Oct, 2021 Issue No.42

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১ম খুতবার শেষাংশ...)

তার (অর্থাৎ মরহুমের) দোয়ার প্রতি আস্থা ছিল; তিনি বলেন, তুমি কাইয়্যুম সাহেবের কাছে যাও। তখন সেই ব্যক্তি কাইয়্যুম সাহেবের কাছে এসে বলেন, আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, আমার সাহায্য যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমার মাধ্যমে তুমি আমাদের ইমাম খলীফাতুল মসীহ্‌কে পত্র লিখ। এরপর তিনি এই চিঠি লিখেন যে, দোয়া করুন যেন এই কাজ হয়ে যায়। তিনি বলেন, মঙ্গলবার তিনি এই চিঠি লিখেন আর পরের দিনই মুষলধারে বৃষ্টি হয় ও বাঁধ পানিতে পূর্ণ হয়ে যায় ।

জামা'তের জন্য তার সেবাসমূহ হলো, পারুং-এ হেডকোয়ার্টার কমপ্লেক্স নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তৎকালীন মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাহমুদ চিমা সাহেব তাকে জানালে তিনি বলেন, কোন চিন্তা করবেন না। আর্থিক দিক থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল বা অর্থ সংকট ছিল। তিনি বলেন, পুরো খরচ আমি বহন করব, আর তা-ই করেছেন। দুই বছরের মধ্যে একটি বড় মসজিদ সেখানে নির্মিত হয়। কেন্দ্রীয় গেস্টহাউজ ও মুবাল্লিগদের কোয়ার্টার নির্মাণের বেশিরভাগ ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন। চারটি কোয়ার্টার এর শতভাগ নির্মাণ খরচ মরহুমের পক্ষ থেকে বহন করা হয়েছে। এম.টি.এ. ইন্দোনেশিয়ার প্রাথমিক দিনগুলোতে প্রায় সকল খরচ মরহুম ও তার স্ত্রী বহন করেছেন। পশ্চিম জাকার্তায় অবস্থিত তার ঘরকেই স্টুডিও হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কর্মীদের ভাতাও মরহুমের পক্ষ থেকে আদায় হতো। ইন্দোনেশিয়ায় প্রাথমিক দিনগুলোতে হোমিওপ্যাথির ঔষধ থেকে নিয়ে ক্লিনিক এর জায়গা পর্যন্ত যাবতীয় ব্যয় মরহুমের পরিবার বহন করেছে। ওয়াহেদ সিনিয়র হাইস্কুলের সূচনালগ্নের নির্মাণব্যয়ও মরহুমের পরিবারের পক্ষ থেকে দানকৃত অর্থে নির্বাহ করা হয়েছে; এর বেশিরভাগ অংশও তারই হতো। কাদিয়ানে নির্মাণাধীন ইন্দোনেশিয়ান গেস্টহাউজ 'সারায়ে আইয়্যুব' এর জন্যও তিনি উল্লেখযোগ্য আর্থিক কুরবানী করেছেন। মরহুম কেন্দ্রের নিকটে অনেক জমি ক্রয় করেছেন এবং পরবর্তীতে আবাসনের জন্য তা জামা'তকে দান করেন। জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রিন্সিপাল মাসুম আহমদ সাহেব লিখেন, কখনো কখনো আমেলার মিটিংয়ে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যেতো। কিন্তু তার ছোট ভাই অর্থাৎ আমীর সাহেব যখন বলতেন- এ বিষয়টি এখন শেষ করুন, তিনি তৎক্ষণাৎ নীরব হয়ে যেতেন এবং আর কোন মতামত ব্যক্ত করতেন না। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো বেনিনের দাউদা রায্‌যাকি ইউনুস সাহেবের, যিনি গত ২৭ আগস্ট তারিখে ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম বেনিনের প্রাথমিক আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নিজ পরিবারে একাই আহমদী ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তার বড় ভাই মরহুম যিকরুল্লাহ্ দাউদ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, যিনি বেনিনের সর্বপ্রথম আহমদী ছিলেন। তার স্ত্রী-সন্তানেরা আহমদী নয়, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও (আহমদীয়াত গ্রহণের) তৌফিক দিন।

আমীর এবং মুবাল্লিগ ইনচার্জ মিয়াঁ কুমর আহমদ সাহেব লিখেন, তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আমাকে তার আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, আমার বড় ভাই যিকরুল্লাহ্ দাউদ, যিনি ইতিমধ্যে নাইজেরিয়াতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তার আহমদীয়াত গ্রহণের কথা যখন আমি জানতে পারি আর একই সাথে লোকমুখে আহমদীয়াত সম্পর্কে নানান কথা শুনি তখন আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। আমি তার হাতে আলাইসাল্লাহু আংটি পরা দেখে তৎক্ষণাৎ আমার বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করি, এটি কিসের আংটি পরে আছেন আর আপনাদের ধর্মে এর মর্যাদা কী? তিনি বলেন, এর ওপর পবিত্র কুরআনের আয়াত লেখা আছে যার অর্থ হলো, আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? আর আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করি যে, আহমদীয়াত কি ইসলাম থেকে ভিন্ন কোন ধর্ম? তিনি বলেন, তোমরা যে ইমামের জন্য অপেক্ষা করছ, আমাদের ভাষ্য হলো- তিনি চলে এসেছেন আর এটিই প্রকৃত ইসলাম। তিনি বলেন, একথা শুনে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক অধ্যয়ন করি আর 'ইসলামী নীতি-দর্শন' পুস্তকটি পড়ে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করে নিই।

তিনি বেনিনের শিক্ষিত লোকদের মাঝে গণ্য হতেন। তিনি ফ্রান্স থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন। বেনিনের বিদ্যুত ও পানি অধিদপ্তরের ন্যাশনাল ডিরেক্টর পদে থাকাকালীন অবসর গ্রহণ করেন। অনেক প্রভাবশালী, শ্মশ্রুধারী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। নিয়মিত নামায আদায়কারী, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত, একজন পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। তাঁদের পুস্তকাবলী অধ্যয়ন ছিল তার দৈনন্দিন অভ্যাস। জামা'তের অনেক দায়িত্বে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন আর বেনিন জামা'তের জন্য তার অনেক অবদান রয়েছে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট বেনিনের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন। মেডিকেল ক্যাম্প ইত্যাদির আয়োজন করতেন এবং নিজে ডাক্তারদের সাথে গিয়ে সারাদিন না খেয়ে মানবসেবায় রত থাকতেন।

ডা. কুমর আহমদ আলী সাহেব বলেন, আমি বেনিনে ডাক্তার হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তিনি বলেন, মেডিকেল ক্যাম্প চলাকালীন ক্লান্তি থাকলেও কিংবা সফরের কারণে দেরিতে ঘুমালেও সবসময় আমি তাকে রাতে দীর্ঘ সময় ধরে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে দেখেছি।

যখনই চোখ খুলেছে তাকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। যখন কোন বক্তৃতা করতেন তখন অত্যন্ত আবেগের সাথে বয়আতের শর্তাবলীর ওপর আমল করার উপদেশ দিতেন। মুবাল্লিগ সিলসিলাহ মোজাফফর আহমদ জাফর সাহেব বলেন, যখনই কোন বক্তৃতা করতেন অত্যন্ত আবেগের সাথে বয়আতের শর্তাবলীর ওপর আমল করার উপর গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি বলেন, (মরহুম) আমাকে বলতেন, প্রত্যেক আহমদী যতক্ষণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম "আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু' না বুঝবে সে জগতপূজারীই থেকে যাবে।

আমীর সাহেব আরো লিখেন, ২০০৬ সালে তিনি ৩০ একর আয়তনের একটি জমি জামা'তকে দান করেন। ২০২১ সালে আমি তার কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করি যে, বেনিনে মাদ্রাসাতুল হিফজের জন্য একটি ভবন নির্মাণ করে জামা'তকে উপহার দিন। এতে তিনি মৃদু হেসে বলেন, ইনশাআল্লাহ্। আর এটির নির্মাণ কাজ আরম্ভও হয়ে গেছে। সবসময় বলতেন যে, জামা'তের শিশুরা যদি পড়ালেখা শিখে ফেলে তাহলে বেনিন জামা'ত আফ্রিকার বড় জামা'তগুলোর অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি শিশুদেরকে জামা'তের মূল্যবান বইপুস্তক পুরস্কার হিসেবে দিতেন। 'বায়তুল ইকরাম' এতিমখানায় গেলে সেখানকার ইনচার্জ ডা. ওয়ালীদ সাহেবকে উপদেশ দেন যে, এই শিশুদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন, কেননা এরা আমাদের জামা'ত এবং জাতির সন্তান আর আমরা সবাই এই শিশুদের পিতামাতা, সেইসাথে তাদের জন্য দোয়াও করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তাদের সবার মর্যাদা উন্নীত করুন। আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা আদায় করব।

****

(১ম পাতার শেষাংশ...)

আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে নবীকে প্রারম্ভিক যুগেই চিনে নেয়, তাদের মধ্যে এবং (আধ্যাত্মিকভাবে) দুর্বল শ্রেণীর মাঝে কোন পার্থক্য অবশিষ্ট থাকবে না। যদি এমন হত, তবে আবু বাকার এবং আবু জাহাল এর মাঝে কি পার্থক্য থাকত? সকলে একত্রে মুসলমান হয়ে যেত, পৃথিবীতে আবু বাকারের যোগ্যতা এবং আবু জাহালের অযোগ্যতা উপলব্ধি করতে পারত না। কাজেই এমনটি করা প্রজ্ঞার পরিপন্থী ছিল। এই কারণেই খোদা তা'লা এক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করেন নি। ফলে যোগ্য এবং অযোগ্য মানুষদের স্বরূপ পৃথিবীর সামনে প্রকাশ পেয়েছে। আবু বাকার, উমর, উসমান এবং আলি (রা.)-এর যুগে জগতবাসী তাদের থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে। সকলেই যদি প্রথম দিন মুসলমান হয়ে যেত, তবে পূর্বের নেতৃত্বের কারণে লোকেরা হয়তো আবু বাকারের স্থানে আবু জাহালক বা অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করত এবং সেই সব কল্যাণরাজি থেকে বঞ্চিত থেকে যেত যা আবু বাকারের ন্যায় সাহাবাদের থেকে তারা লাভ করেছিল, যারা প্রাথমিক যুগে ঈমান এনেছিলেন। আলীম বলার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে এই প্রজ্ঞার কারণে বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু এতে হতাশ হয়ে পড়ে উচিত নয়। সর্বজ্ঞানী খোদা তোমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, ভবিষ্যতে সমগ্র আরবের মানুষ এই ধর্ম-নীতির উপর একত্রিত হবে। পরলৌকিক জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে যে, একদিন পূর্বের ও পশ্চাতের সকলকে আল্লাহ্ তা'লার নিকট একত্রিত করা হবে, এবং তারা নিজের নিজের কর্মফল পাবে। কাজেই মুসলমানেরা যে প্রারম্ভিক দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করছে, সেগুলি নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, কিম্বা সেই সব লোকদের অকৃতকার্য বলে ধরে নেওয়া উচিত নয় যারা এই শয়তানী ও রহমানি যুদ্ধে বিজয়ের পূর্বে নিহত হবে। কেননা প্রকৃত বিচার দিবস মৃত্যুর পর আসবে আর আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান ইহজগতকে প্রকৃত বিচার দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয় নি।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫০, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir